কবির নিজের করা ইংরেজি অনুবাদ

Banalata Sen

Long I have been a wanderer of this world.
many a night
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The ocean of Malaya.
I was in the dim world of Bimvisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds—
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as nights at Vidisha,
Her face : image of Sravasti; the pilot,
Undone in the blue milieu of the sea
Never twice sees the earth of grass before him.
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone
Off the Kestrel's wings. Light is your wit now,
Fanning Fireflies that pitch the wide things around.
I am ready with my stock of tales
For Banalata Sen of Natore.

জীবনানন্দের নিজের করা ইংরেজি অনুবাদেও মূল কবিতার মতোই জটিলতা। এখানে বরং আরো বেশি। কারণ মূল 'বনলতা সেন' কবিতায় যেখানে শুধু যতিচিহ্নের সমস্যা, এখানে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ওলটপালট, কোথাও পুরো লাইনই হাওয়া। এখানেও আগের অনুসরণে বিকল্প পাঠটুকু উল্লেখ করা হলো :

প্রথম লাইনের শেষে *world*-এ অন্যত্র আছে কমা (,); দ্বিতীয় লাইনের শেষে *night*-এ কমা; তৃতীয় লাইনে *somewhere*-এর বদলে আছে *somewhat;* চতুর্থ লাইনে *ocean*-এর বদলে আছে *seas;* সপ্তম লাইনে *sounds*-এর শেষে ড্যাশ-এর বদলে কমা; নবম লাইনে *nights*-এর জায়গায় *night;* দশম লাইনে *face : image*-এর বদলে আছে *face an image* এবং *Sravasti;*-এর বদলে *Sravasti as;* একাদশ লাইনের শেষে *sea*-র পর কমা; দ্বাদশ লাইনে *sees*-এর বদলে *saw* এবং লাইনের শেষে ফুলস্টপের বদলে কমা; ত্রয়োদশ লাইনে *also* নেই; সপ্তদশ লাইনের শেষে *around*-এর পর ফুলস্টপ নেই এবং অষ্টাদশ লাইন—*I am ready with my stock of tales*—পুরোটিই নেই। এছাড়া *মালয়, বিম্বিসার, শ্রাবস্তী* ইত্যাদির ইংরেজি বানানও নানা রকম —*সম্পাদক*।

কবির অনুমোদনকৃত ইংরেজি অনুবাদ

Banalata Sen

Translated by Martin Kirkman

A thousand years I have wandered upon the earth
From the sea of Ceylon to the midnight sea of Malay.
Much have I wandered; in the grey lands of Vimvisar
and Asoka—
There have I been; and to dark, distant town of Vidarva;
Tired of this life, this foaming sea of life,
I found peace for a while with Banalata Sen of Natore.

Her hair is dark as the nights of far Vidisha.
Her face the architecture of Sravasti. As the rudderless pilot
Drifting and lost on a distant sea
Sees the island of cinnamon trees and green grass below,
So have I seen her in darkness, who asked me; where
have you been
So long away? This she asked raising her bird's-nest
eyes, Banalata Sen of Natore.

At the day's ending evening falls with soft sound of dew;
The kite shakes the smell of the sun from her wings,
And when earth's colours fade the fireflies weave
a tapestry of brilliant stories,
Birds return to their nests—all the rivers flow home—
the ledger of life is closed.

Only darkness remains, the time to return to Banalata Sen of Natore'

Modern Bengali Poems, ed. by Debiprasad Chatterji. The Signet Press, Calcutta, December 1945 সংকলনে অন্তর্ভুক্ত

Banalata Sen of Natore

Translated by Chidananda Dasgupata

For aeons have I roamed the roads of the earth
From the seas of Ceylon to the straits of Malaya
I have journeyed, alone in the enduring night,
And down the dark corridor of time I have walked
Through mist of Bimbisara, Asoke, darker Vidarbha.
Round my weary soul the angry waves still roar;
My only peace I knew with Banalata Sen of Natore.

Her hair was dark as night in Vidisha,
Her face the sculpture of Sravasti.
I saw her, as a sailor after the storm
Rudderless in the sea, spies of a sudden
The grass green heart of the leafy island.
"Where were you so long?" She asked, and more
With her bird's nest eyes, Banalata Sen of Natore.

As the footfall of dew comes evening;
The raven wipes the smell of warm sun
From its wings; the world's noises die.
And in the light of fireflies the manuscript
Prepares to weave the fables of night,
Every bird is home, every river reached the ocean.
Darkness remains; and time for Banalata Sen.

চিদানন্দ দাশগুপ্তর করা এই ইংরেজি অনুবাদটি সাহিত্য অকাদেমি-প্রকাশিত *Jibanananda Das* পুস্তিকায় সংকলিত (১৯৭২)

ফ্রাঁস ভট্টাচার্যকৃত ফরাসি অনুবাদ

Bonolota Sen

Des milliers d'anne es j'ai parcouru les chemins de la terre,
De la mer cinghalaisé á l'oce an malais, dans la nuit sombré
J'ai erré, dans l'univers grisátre de Bimbisar et d' Ashoka
N'étais-je pas la? Plus loin encore, dans la ville de
Vidarbha enténébrée
Je fus un vivant fatigué; perdu au milieu de l'océan
écumant de la vie,
Elle m'a donné un moment de paix, elle, la femme de Natore,
Bonolota Sen.

Sachevelure sombre comme l'antique nuit de Vidisha,
Son visage une oeuvre d'art de Shrabasti; comme le
navigateur qui,
Perdu dans la mer infinic, son gouvernail brisé, se désespére
Et apercoit soudain le pays de l'herbe verte, au milieu
de la cannelle,
Ainsi je l'ai vue dans les ténébres, 'Ou' étiez-vous tout ce.
temps?' me dit-elle
Elle leva vers moi ses yeux comme des nids d'oiseaux, la
femme de Natore, Bonolota Sen.

A la fin du jour le soir vient comme un bruit de rosée.
Le milan efface de ses ailes la senteur de soleil;
Une fois éteintes les couleurs de la terre la manuscrit se
prepare
Alors pour le conte, les lucoles multicolores etincéllent;
Tous les oiseaux rentrent chez eux—toutes les riviéres—les
marchés de cette vie prennent fin;
Seules demeurent l'obscurite, l'intimite et la présence de
Bonolota Sen.

Banalata Sen

Translated by Fakrul Alam

For a thousand years I have walked the ways of the world,
From Sinhala's Sea to Malaya's in night's darkness,
Far did I roam. In *Vimbisar* and *Ashok's* ash-grey world
Was I present; Farther off, in distant *Vidarba* city's darkness,
I, a tired soul, around me, life's turbulent, foaming ocean,
Finally found some bliss with *Natore's Banalata Sen.*

Her hair was full of the darkness of a distant *Vidisha* night,
Her face was filigreed with *Sravasti's* artwork. As in a far-off sea,
The ship-wrecked mariner, lonely, and no relief in sight,
Sees in a cinnamon isle sings of a lush grass-green valley,
Did I see her in darkness; said she, "Where had you been?"
Raising her eyes, so bird's nest-like, *Natore's Banalata Sen.*

At the end of the day, with the soft sound of dew,
Night falls; the kite wipes the sun's smells from its wings;
The world's colors fade; fireflies light up the world anew;
Time to wrap up work and get set for the telling of tales;
All birds home—rivers too—life's mart close again;
What remains is darkness and facing me—Banalata Sen!

1999

বনলতা সেন

আবদুল মান্নান সৈয়দ

তিনটি স্তবকে সমাপ্ত এই কবিতাটি, 'বনলতা সেন', যেন এক অনিঃশেষ ফোয়ারা—অনন্ত কাব্যোৎসারের। কবিতার—হয়তো যে-কোনো শিল্পেরই—প্রসঙ্গ থেকে প্রকরণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা সমীচীন নয়; আমাদের যাত্রা প্রকরণের পরিচয় দিতে দিতে প্রসঙ্গের প্রতিভাস রচনা করায়।

সমান ওজনের—ছয় লাইনের তিনটি স্তবক। কবিতা জ্যামিতি নয়; কিন্তু কবিতায় থাকে এক ভিতর-জ্যামিতি। সেই ভিতর-জ্যামিতির গোপন কাজ চলেছে এখানে তিনটি স্তবকের ত্রিলোক বিহারে। প্রথম স্তবকে কবির আত্মপরিচয়; দ্বিতীয় স্তবকে দয়িতা-পরিচয়; তৃতীয় স্তবকে উভয়ের সংঘট্টজনিত এক পরিণাম, এক স্বপ্নোচ্চারণ—স্বপ্নই এখানে সত্য, সেই হিশেবে সত্যোদ্‌ঘাটনও বটে।

প্রথম স্তবকে যে-পথিকচিত্ততা প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্তবকে তারই অপর পিঠ নাবিকচিত্ততা। এই অনন্ত পথিকচিত্ততা একটি অতিসাধারণ প্রাকৃত বাক্যোচ্চারণে রূপায়িত : 'হাজার বছর ধরে', 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক', 'দু-দণ্ড শান্তি'—পরে 'এতদিন কোথায় ছিলেন', 'সব লেনদেন' প্রভৃতি মৌখিক বাকপ্রয়োগে। যে-ইতিহাসচৈতন্য জ্ব'লে উঠেছিলো এমনকি 'ঝরা পালক'-এই 'মিশর-ব্যাবিলন-নিনেভ-এর স্মরণিকায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র অতিপ্রাতিস্বিক জগৎ পেরিয়ে আবার তা রূপচরিতার্থ খুঁজে নিলো 'বনলতা সেন' কবিতায় (এবং 'বনলতা সেন' কবিতা-গ্রন্থের আরো কবিতা-কতিপয়ে)। হাজার-বছরব্যাপী ভ্রাম্যমাণ এই পথিকচিত্তের ক্লান্তি ও শান্তিদায়িনী বনলতা সেন পাশাপাশি উপস্থিত। কালিক পরিচয় প্রকাশের পরে স্থানিক বিশিষ্টতাও জীবনানন্দ ফোটাতে চেয়েছেন এখানে : সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর—তারই পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে সমকালীন একটি সামান্য শহর—নাটোর। সেই নাটোরদুহিতা বনলতা সেন-ই কবির হৃদয়দয়িতা।

দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রাম্যমাণ মানস প্রকাশিত হয়েছে নাবিকী উচ্চারণে, যা পথিকবৃত্তিরই অপর প্রকাশ। দয়িতাকেন্দ্রিক এই স্তবকে সরাসরি নগর নয় আর, ব্যবহার করা হচ্ছে নগরস্মৃতি—দয়িতার কেশদাম বিদিশার কৃষ্ণ রজনীর স্মারক, আনন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের স্মারক। সুতরাং এখানেও তলে তলে ইতিহাসের তথা ভ্রাম্যমাণ মানসের পূর্বতন ব্যাপ্তি রক্ষা করেছেন কবি। দর্শনীয় দয়িতাটি : চুল, মুখ, চোখের বর্ণনা করেছেন কবি তার—তবু তার উপর যেন রহস্যের পরদা লুটিয়ে থাকে। তার কারণ জীবনানন্দীয় উপমার কুশলতা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'অনাঘ্রাতা পূজার ফুল দু'টি, তখন কোনো তরুণীর স্তনযুগল আমাদের চোখের সম্মুখে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বিদিশার নিশার মতো চিকুরজাল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো আনন, পাখির নীড়ের মতো চোখ—এই তিনটি শারীরিক

উপমার একটিও কোষ-তলোয়ার সাম্বন্ধিক উপমা নয়। 'বিদিশার নিশা' বা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' আমরা পাঠকেরা কেন, কবি নিজেও দ্যাখেননি; তবু যখন বিদিশার সঙ্গে উপমিত হয় কেশরাশি, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে আনন-সৌন্দর্য—তখন আমাদের চোখের সম্মুখে কবিপ্রিয়ার অসম্ভব সৌন্দর্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ যদি শুধু 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' উপমাটি পড়ে তা অর্থহীন মনে করে, তাকে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু তার আগের স্তবকে আমরা এ রকম দুটি চরণ পড়েছি : 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক; চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন/আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।' এবং বর্তমানে স্তবকেই পড়েছি সেই হাল-ভাঙা নাবিকের কথা, কবি যার সঙ্গে নিজেকে তুলিত করেছেন, যে অতিদূর সমুদ্রের মধ্যে সহসা সবুজ ঘাসের দেশ লক্ষ্য ক'রে আনন্দে উন্মাতাল হ'য়ে উঠেছে;—এর পরে পাখির নীড়ের মতো চোখ-যে ক্লান্তপ্রাণ কবির আশ্রয়-আধার হ'য়ে উঠবে, তা কি ব'লে দিতে হয়। একটি পরোক্ষ উপমাও ব্যবহার করেছেন কবি : সবুজ ঘাসের দেশ—যা বনলতা সেন-এর দেহের উপমা কিন্তু শরীরের চেয়ে বেশি। সুতরাং শরীর সম্বন্ধীয় হ'লেও এইসব উপমা—বিদিশার নিশার মতো চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, পাখির নীড়ের মতো চোখ, বা এমনকি সবুজ ঘাসের মতো দেহ—এদের আমরা বলবো আত্মিক উপমা। বাংলা কবিতায় আত্মিক উপমাসৃজন জীবনানন্দের দান। এই কবিতায় দয়িতার সেই অতিসাধারণ ও অনন্ত জিজ্ঞাসা 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' নিরুত্তর থেকে যায়। কিন্তু এ তো ঠিক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে উপস্থাপন : এই উক্তির মধ্য দিয়ে দয়িতা নিজের আর্তি ও আবেদনের আকুলতা রাষ্ট্র ক'রে যায়।

তৃতীয় স্তবকে অঙ্কিত হয়েছে দিনান্তের একটি চিত্র, যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু গভীরভাবে অনুস্যূত মূল প্রসঙ্গের সহিত। এই দিনান্ত আসলে প্রাগুক্ত যাত্রাশেষের মুহূর্ত : 'সমস্ত দিনের শেষে' অর্থ সমস্ত যাত্রার শেষে। সন্ধ্যা বা আসন্ন রাত্রির এই পটভূমিকায় এই মন্তব্য; তাই অন্ত্যসূচক এ ধরনের পঙ্‌ক্তি রচিত হয় : 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন।' জীবনের সব লেনদেন ফুরোনোর পরেও দেখা যাচ্ছে : 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' জীবনের সব লেনদেন ফুরোনোর পরেও বনলতা সেনের সঙ্গে কবির মুখোমুখি উপবেশন সম্ভবপর হয় কিভাবে? কবির উত্তরকালীন দুটি কবিতাংশ এই মুহূর্তে আমাদের সহায়ক হতে পারে :

১. তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
সেই মুখ আর আমি রবো এই স্বপ্নের ভিতরে।

বুনো হাঁস, বনলতা সেন

২. উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

স্বপ্ন, মহাপৃথিবী

'বনলতা সেন' কবিতার শেষাংশেও কবিমানব লুপ্ত হ'য়ে গেছে, জেগে আছে স্বপ্ন, স্বপ্নের ভিতরেই কবি ও বনলতা সেন মুখোমুখি উপবিষ্ট।

তিনটি স্তবকেরই উপান্ত্য লাইনের শেষে ফিরে-ফিরে আসছে বনলতা সেন, গানের ধ্রুবপদের মতো। 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' এই অংশের মধ্য-মিল কবিতার আভ্যন্তরিক অর্থের দিক থেকেও মূল্যবান। যেমন আগের স্তবকে 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'র পরপর চারটি মধ্য-মিল আঘাতে-আঘাতে যেন স্তর-

পরম্পরাক্রমে আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে গেছে; কেননা ঐ লাইনটি আমরা পড়ি এভাবে : 'চুল তা-র কবেকা-র অন্ধকা-র বিদিশা-র নিশা।' তেমনি অন্বয় রক্ষা করেছে কবিতায় উক্ত দীর্ঘ ক্লান্ত যাত্রার সঙ্গে এই কবিতার দীর্ঘ মন্থর চরণাবলি : 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। সূচনাপঙ্‌ক্তির বাইশ মাত্রা এইভাবে পথযাত্রাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। বনলতা সেন নামের বনলতা-অংশটি হয়তো কোনো তন্বঙ্গীর আভাস দ্যায়, কবি যার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কয়েকটি রেখায়। কিন্তু সেন-উপাধিধারিণী নাটোর নামক স্থানের অধিবাসিনী হিশেবে কবি তাঁর দয়িতাকে যতোই শরীরী ক'রে তুলতে চেষ্টা করুন-না কেন, তার উপর কেবলি লুণ্ঠিত থাকে এক অভেদ্য রহস্যের বহুস্তর আবরণ। সে হ'য়ে ওঠে স্বপ্ননায়িকা; এবং বাস্তব থেকে স্বপ্নে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের সকলেরই দয়িতা। *(১৯৭১)*

শুদ্ধতম কবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭ নলেজ হোম, ঢাকা

বনলতা-উপাখ্যান

মোহাম্মদ রফিক

দেখতে গিয়েছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ফ্রানসিস্কোতে অবস্থিত মুইর উডস অ্যান্ড মিডোজ। গোল্ডেন গেট পেরিয়ে গাড়িতে প্রায় বিশ মিনিটের পথ। দেখলাম গাছ দিব্যি বেঁচে আছে দশ হাজার বছর, পাঁচ হাজার বছর, তিন হাজার বছর—এখনও চিড় ধরেনি চামড়ায়; মাথায়। চুল সাঁতরে ভাসতে শুরু করেনি চড়া; দেখলে বলা যাবে না যে বয়স ছুঁয়েছে বার্ধক্যের কাল, তখনও বুঝি প্রৌঢ়ত্ব ছুঁই ছুঁই, না তাও নয়। তাই খুব স্বাভাবিক বলে ওঠা, এই তো সেদিন, যিশুর জন্মের শ তিনেক বছর পূর্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মেছিলেন বৈজ্ঞানিক অঙ্কবিদ এরাস্টোথেনিস। তারও জন্মের কিছু পূর্বে মিশরীয় ফ্যারো নেচো ফিনিসীয় নাবিকদের উৎসাহিত করেছিলেন সমুদ্রযাত্রায়। ছোট ছোট নৌকায় তারা বেরিয়ে পড়েছিল আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে। সেই থেকে শুরু—এই গাছগুলি কিন্তু তখনও ঠিক এইভাবে এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। তখন কোথায় ছিল ক্যালিফোর্নিয়া, কোথায় ছিল আমেরিকা, হয়তো সবই ঠিক ছিল, শুধু নামগুলি ছিল না। অপরিচয়ের অসীমতায় তখনও স্পষ্টতা পায়নি আজকের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়লিপি। একবার আগুনের ভেতরে দাঁড়ালে যে-কেউকে দেয়া যায় যে কোনো পরিচয়, ডাকা যায় যে কোনো নামে, সম্ভব মনে হয় যে কোনো সম্ভাবনাকে। তা হলে তোমারই নাম, বনলতা সেনও হতেও পারে, অনন্ত নক্ষত্রলোকে একটি মাত্র নক্ষত্র, শত সহস্র চেনা আধা চেনা দঙ্গলে একটি অচেনা মুখ। অবশ্য, আমাদের চেনাজানা সাহিত্যের প্রথম মানুষ গিলগামেশও বেরিয়েছিলেন অভিযানে। তবে স্বপ্নে ও বাস্তবে তার যাত্রাপথ প্রলম্বিত আকাশে ও মর্ত্যে। রাম-লক্ষ্মণ পার হয়েছে সমুদ্র, তবে পাড়ি ধরেনি। তাদের বিচরণ মর্ত্যে বা শূন্যে। পাণ্ডব কৌরব রাজপুত্রগণ অধিকতর ব্যস্ত ছিল রাজ্যশাসনে, কূটকচলামিতে, নারীহরণে এবং সন্তান প্রজননে। তবে তারাও যে অভিযানে বেরোয়নি, তা নয়। যদিও, তারাও যাত্রী মূলত মর্ত্য ও আকাশের। হয়তো মানুষ তখনও আবিষ্কার করেনি সমুদ্রের অজানা বিস্ময়, শোনেনি তার সুদূর রহস্য-মাতাল আহ্বান। মাটি ও আকাশ তার অস্তিত্বের অংশীদার, বেঁচে থাকার উপাদান ও সঙ্গী। মাটি খনন ও শস্য উৎপাদনেই ব্যয়িত তার সমস্ত কল্পনা মেধা। আরও অন্য ধরনের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক কারণ থাকাও যথেষ্ট অসম্ভব নয়। ২০-২১ দিনের পথ অদিসিউসকে ঘুরিয়ে আনতে হোমার নিয়েছেন দশ দশটি বছর। কী আশ্চর্য, তিনি তাকে নান্দনিক অর্থে বিশ্বাসযোগ্যও করে তুলেছেন। ট্রয়ের সন্তান, রোমের প্রতিষ্ঠাতা ইনিয়াসকে তো পাড়ি ধরতেই হবে বিপুল সমুদ্র এবং ভূ-ভাগ যেহেতু সে দুই সভ্যতার সূত্রধর। দান্তে, দান্তের বিকল্প সত্তা, মর্ত্যের বাসিন্দা, ঊর্ধ্বলোকের আরোহী। যতই বাড়তে থাকল মানুষে মানুষে লেনদেন, এক ঘাটের পণ্য ভিড় জমাল অন্য ঘাটে, মানুষের নিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা উন্মোচিত করে চলল দিগন্তের ওপারে দিগন্ত, দিগ্বিজয়ের পতাকা উড়তে থাকল তীর থেকে তীরে সমুদ্রঅভিযাত্রীদের উপস্থিতি দুর্মর হয়ে উঠল রেনেসাঁস থেকে রোমান্টিকতায়, বুর্জোয়া উত্তরণ হয়ে আধুনিক চৈতন্যের দিগ্বলয়ে। এ তো গেল পশ্চিমি কবিতায় একজন নাবিকের আবির্ভাব ও জগৎজয়ের কাহিনী। আমাদের বিস্তীর্ণ মাঠের পর মাঠ প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে চলেছে একজন অক্লান্ত পথিক। সে বৈষ্ণব, সে সুফী, সে কীর্তনীয়া, সে এক

হাটের পণ্য পৌঁছে দেয় অন্য হাটে। সে বুদ্ধ সে আনন্দ সে সুজাতা গৃহের আঙিনা থেকে আঙিনায়, দ্বার থেকে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি ভরে নেয় মানুষ ও সভ্যতার দানে। এই বিশ্বমানবের বিপুল অভিযাত্রার অংশীদার সে এগিয়ে নেয় সভ্যতাকে। গাড়িয়াল ভাই গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে চিলমারী বন্দর, আর সে গাড়ির চাকার দাগ গেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অবশ্য মাঝে মধ্যে একজন নাবিক একজন চাঁদ একজন ভাড়ু দত্ত এই পাড়েও উঁকি মেরেছে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে। আর নাবিকের সঙ্গে পদ্মা মেঘনার মাঝির যোগসূত্রও নয় নিতান্ত দূরান্বয়ী ক্ষীণ। তারা দুজনই তো একই জলের অভিশাপ মন্থন করে জেগে ওঠা একই মায়ের দুই সন্তান। কাল থেকে কালে কৃষ্ণ এবং অর্জুন।

তা হলে একজন 'নাবিক' আর একজন 'পথিকের' অভিযান কাহিনীর অন্য পরিচয়ই বোধ হয় মানব সভ্যতা বা সভ্যতার ইতিহাস। 'মোর পথিকেরে তুমি এনেছো দুয়ারে লেগেছে তার রথ' রবীন্দ্রনাথের পথিক ফিরে চলেছে 'পথ চিনে চিনে' 'দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে' 'দেখিতে' তার প্রথম প্রিয়ারে, সব ফিরে চলাই কি প্রকৃতপক্ষে সামনে চলা আর প্রিয়া, প্রথম প্রিয়া...? সে কি নয় এই জল এই হওয়া এই আলো—আমরা যাকে বলি উৎস অনুপ্রেরণা। সে যা-ই হোক, প্রায় সব কথার কথা রূপকথা উপকথার মতো এও এক নিজের কাছে নিজের ফিরে-আসা। প্রতিটি প্রত্যাবর্তনই পথ দেখায় বেবিলনের ট্রয়ের উজ্জয়িনীপুরের বিদর্ভ নগরের। কাল ছুঁয়ে, কালের ওপর কারে, ফিরে ফিরে আসে দূর অভিযাত্রী; দূর সব সময়েই এই ছুঁয়ে-যাওয়া।

আদম হাওয়ার কাহিনীটি মন্দ নয়, বেশ জমাট, তাৎপর্যময় এবং দুরভিসন্ধিমূলক। এবং উলটে বলা উচিত দুরভিসন্ধিমূলক তাই তাৎপর্যময়, তবে কাহিনীটি কি রূপক না প্রতীকী, কোনো কোনো অলিখিত চলমান কবিতার প্রথম স্তবক বা পঙ্‌ক্তি, কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদ, উপন্যাসের গল্পোন্মোচন বা নাটকের প্রথমে অংকের প্রথম দৃশ্য; এসব কোনো কিছুই নয়, সব কাহিনীর শেষ অন্তকাহিনী নিরালম্ব পড়ে আছে মাঠ ঘাট জুড়ে, প্রতিদিন বেড়ে উঠছে প্রতি ঘরে আঙিনায়, চুল মেলে দিচ্ছে হাওয়ায়, প্রতীক্ষায় জলে কিংবা ভস্মে ভরে উঠেছে চোখ; কিংবা এসবই অন্য কিছু নয়, অনন্তের চিতা জুড়ে এক মুহূর্তের অগ্নিবিন্দু, সারাৎসার। ইনিয়াস পরিত্যাগ করে চলেছে কার্থেজ ডিডোতে এবং তারও বহুপূর্বে হেলেন, ক্লাইটেমেনেস্ট্রা, ক্যাসান্ড্রা প্রতিদিন গুনছে দিন দিনের উত্তপ্ত অভ্যন্তরে দগ্ধ কিংবা উল্লসিত, নানান প্রতিক্রিয়ায়। জাহাজের দাঁড় গুনছে ঢেউয়ের চলে যাওয়া ফিরে আসার শব্দ। শুধু শব্দও অনুভব, বয়ে যায় জীবনে কবিতার যোগে ও বিয়োগে গাণিতিক মাত্রায়। লেসবিয়া-কাতুল্লাস পেত্রার্ক-লরা দান্তে-বিয়াত্রিচে, স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠাও সঙ্গত প্রথম কাহিনী কি এগিয়ে চলেছে না পিছিয়ে পিছিয়ে, রচিত হয়ে চলেছে এক আদি ও অনাদি কাহিনীর ভেতর উপমার ভেতর উপমা, উৎপ্রেক্ষার অন্তর্লীন উৎপ্রেক্ষা! এই আয়োজনে, এই দুর্ভিক্ষ, এই সমহার, এরই অন্য এক প্রান্তিক প্রদেশে হঠাৎ কীটস শুনে ফেলেন এক অচেনা পাখির ক্ষণিক সংগীত কিংবা হোল্ডার্লীন চিৎকারে ভেঙে যেতে যেতে ফের ডেকে ওঠেন, 'দিওতিমা...'। এক আশ্চর্য অভিযাত্রা ক্ষণে ক্ষণে ফিরে-আসা, এই ক্ষণে সঙ্গীহীনের সঙ্গী শুধু জল হাওয়া, আকাশ, নক্ষত্র... স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতির অন্তরাল। কর্মই কর্মের সঙ্গী, একক এবং স্বতন্ত্র অনুভব অনুভবের অনুঘটক, কবিতা কবিতার। বিশ্বের কোন ভাষায় কোথায় কী লেখা হয়েছে, জানা বা জেনে ফেলা অবান্তর, কোন লতা লতিয়ে উঠেছে কোন বৃক্ষে, কোন গাছে ধরেছে কোন ফল; কারণ এ-তো একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি, অনন্তর একই ঢেউয়ের এক-একটি ঢেউ। ঢেউ ও নুন এসে থাপড়িয়েছে জাহাজের গায়, কবিতার শরীরে। এক-একজন নাবিক বা পথিকের মতনই প্রতিটি কবিতা একই সঙ্গে বিশেষ দেশ ও কালের নাগরিক বা অধিবাসী, একই সঙ্গে সে অধিবাসী বিশ্বের সময়হীনতার। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকতেই পারে তার গোত্র বা জাত পরিচয়, তবে চেহারার আদল তো খুঁজেই পাওয়া যাবে অন্য কালের অন্য পারের মানুষের ভেতর। বাইরে না মিললেও মিলবে অন্তরে। তাই তো উঠে আসবে অনেক নাম, হোমার, কলরিজ থেকে শুরু করে এডগার পো; অনেক

নামের ভিড়ে হারিয়ে যাবে আরও অনেক নাম। নিশ্চিত আগামীতে, আফ্রিকার বা অস্ট্রেলিয়ার বা লাতিন আমেরিকার উপকূল বেয়ে উঠে আসবে এমনি অনেক নাম। এতদিন যারা ছিল অনাবিষ্কৃত তারা জমাট আড্ডা জমাবে বন্দরে বন্দরে, অতিথি কবিতার পালা পার্বণ-উৎসবে। আপাত অপরিচয়ের ঘোর কেটে যেতেই বা মুখ চোখ থেকে ঝরে পড়তেই দূর ভ্রমণের ক্লান্তি বিভা অশোকের বিম্বিসারের ধূসরতা বা বিদর্ভ নগরের দূরত্ব তার চোখের সম্মুখে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠবে উজ্জয়িনীপুরের দরদালান, মুখে লোধ্ররেণু মাথায় কুরুবক, দুটি শিশু নীপতরু, তোরণের শ্বেতস্তম্ভ ক্রমশ ক্রমশ। রং এবং রং-এর গাঢ়ত্ব ধারণ করতে থাকবে চুল ও অন্ধকার, বিদিশার নিশা, মুখ ও শ্রাবস্তীর কারুকার্য। অভিশাপ বা বিচ্ছেদ তাড়িয়েই বা নিতে পারে তার কত দূর। তারপরই শুরু হয় উলটোযাত্রা। ডাঙার পর ডাঙা পেরিয়ে জলের পর জল ফের অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে ফিরে আসা। সুতরাং নৈরাশ্য বা বিলয় নয়, আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টিই মূল সার। আকাশ ও মর্ত্যে শূন্যতা থেকে কবিতায় পাড়ি ধরে কল্পনা, কল্পনার অপরিণামী দাঁড়। কেউ কেউ হয়তো ফিরে ফিরে বহুদূরে 'পথ চিনে চিনে' 'হাজার বছর ধরে' পথ হেঁটে 'পৃথিবীর পথে' এসে পৌঁছে যায় কিংবা ভাবে পৌঁছে গেছে যেখানে 'প্রিয়ার ভবন/বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন'। 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'।

একেই বলে উত্তরাধিকার। একই কাহিনীর দুটি পাঠ। একজন পথিক এবং অন্যজন নাবিক, দুজনই সভ্যতার ও মানুষের দীর্ঘ পাড়ি ধরে উপস্থিত আজকের দ্বারপ্রান্তে বা সাগরতীরে, অচেনা বা ভুলে যাওয়া বা ভুলে না-যাওয়া অতিথি। যে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর প্রতীক্ষায়, সেও প্রতীক্ষায় ক্লান্ত এবং উন্মুখ, 'তার মুখে লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে/কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে'। সে এসে সম্মুখে দাঁড়ায় 'প্রতিমার প্রায়/নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নক্ষত্র নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়'। কিংবা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। দেখা মেলে, অন্ধকারে, হয় অনালোকিত সুরম্য অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে, না হয় 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'-এ। সম্ভাষণের শব্দগুলোও প্রায় একই, 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' কিংবা, 'এত দিন কোথায় ছিলেন?' যেন এ-ই নিয়তি এবং ইতিহাস নির্ধারিত অপচয়ের রেশ কাটার নয়, কেটে যাওয়াটাই পুরো অনভিপ্রেত। অতঃপর 'ন্যুহি জানি কখন কী ছলে/সুকোমল হাত খানি লুকাইল আসি/... দক্ষিণ করে, কুলায়প্রত্যাশী/সন্ধ্যার পাখির মতো'। এরপর কি অবধারিত হয়ে পড়ে না 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'-এর ঘোরলাগা অভিজ্ঞান বা কাব্যিক অভিজ্ঞতা বা অভিযান। ক্রমশ কাল ও ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র 'রজনীর অন্ধকার/...করি দিল একাকার/দ্বীপ দ্বারপথে/কখন নিবিয়া গেল দূরন্ত বাতাসে'। 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;/ ...সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;' যেন অনন্তকাল, কৃষি খেত থেকে বন্দরে বন্দরে জাহাজের মাস্তুল ছুঁয়ে গৃহ থেকে গৃহে আলো নিভে আসার ছায়া; অনির্বচনীয় কিছু পঙ্‌ক্তি লিখে চলেছে অন্য সব পঙ্‌ক্তির অফুরান বেঁচে ওঠার বেঁচে থাকার মন্ত্রণা।

'শিপ্রানদী তীরে আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে'। 'তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল' 'পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন'... অন্য কালে অন্য এক বনলতা সেনের উপাখ্যান লেখা হবে অন্য কবি ও মানুষের জীবনে, উদ্যমে ও ব্যর্থতায়। 'পৃথিবীতে সব রঙ নিভে গেলে' তারই প্রস্তুতি সর্বত্র আলোতে হাওয়ায়। সে হবে সভ্যতার অন্য এক উদ্ধার। দারুচিনি বা এলাচের না হলেই-বা কী এসে যায়, ক্যালিফোর্নিয়ার দূরদেশী গাছগুলোর পিছে ফিরে-ফিরে যাওয়া স্মৃতিও যেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ছুঁয়ে একই সাক্ষ্য বহন করে আসছে; কানে কানে বলে, হে পথিক, হে নাবিক, ফিরে এসো, ভালোবাসো। তখনই হাওয়া কিন্তু নাড়িয়ে দিলে পাতার ওপরে পাতা, পাতার ভেতরে পাতা এবং পাতার ফাঁক সরিয়ে চেয়ে রইল একটি পাখির নীড়, যদিও কোন পাখির, বলে দেবে কে! এই জীবনানন্দ!

বনলতা সেন

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

একেকটি কবিতা খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। সেটিই যে একজন কবির উৎকৃষ্টতম কবিতা, এমন নাও হতে পারে। অথবা কারো কারো কাছে তা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতম। নজরুল একটি কবিতা লিখেই রাতারাতি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে যান। সেটি যে 'বিদ্রোহী'—কাউকেই বলে দিতে হয় না। সে ছিল ১৯২১ সাল। তার প্রায় দেড় দশক পরে প্রকাশিত জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'। অন্য আরো তিনটি কবিতার সঙ্গে 'বনলতা সেন' 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৪২ সংখ্যায় বেরোয়। এই একটি কবিতা জীবনানন্দকেও জনপ্রিয় করে তোলে, যদিও অভ্যস্ত রুচির কাছে কবিতাটি তেমন সমাদৃত হয় নি। অন্তত প্রাথমিকভাবে তো বটেই। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি আলোচিত ও ব্যবহৃত হতে হতে অবিস্মরণের গৌরব লাভ করেছে।

কবিতাটি প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন : "ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেন'। Timeless এবং Temporal-এর এমন সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে হয়নি। বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকালে সীমাবদ্ধ নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভূগোলের বিস্তৃতি ও ইতিহাসের বোধ (depth)। এই দুই আয়তনের যোগে একটি ক্ষুদ্র লিরিক মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে।"

মহাপয়ারনির্ভর আঁটোসাটো লিরিকটি জীবনানন্দের রচনাশৈলীর প্রায় সমস্ত শনাক্তকরণ চিহ্ন বহন করছে। ইতিহাস ভূগোলের প্রেক্ষাপট ছুঁয়ে থাকলেও কবিতাটি মূলত স্মৃতিসঞ্জাত একান্ত ব্যক্তিগত কবিতা। অস্পষ্ট, ধূসর ও সুদূর বাতাবরণে স্বপ্নময় অতীতমন্থনের কবিতা এটি। প্রেমের অচরিতার্থতা নয়, যেন প্রাপ্তির অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকা শান্ত দুই প্রেমিকযুগলের নীরবতাময় তৃপ্তির শব্দচ্ছবি। সে যেন ইয়েটস কথিত 'dream-heavy land'.

মনে পড়ে অ্যাডগার অ্যালান পো-র 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটি। 'To Helen' কবিতাটি ১৮৩১ সালে রচিত। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর শতাধিক বছরের আগের কবিতা সেটি। সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

'Helen', thy beauty is to me
Like those Nice an barks of yore
That gently, O'er a perfumed sea
The weary, wayworn wanderer bore
To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam
Thy hyacinth hair, thy classic face
Thy Naiad airs have brought me home

To the glory that was Greece
And the grandeur that was Rome.

Lo! in you brilliant window-niche
How statuelike I see thee stand,
The agate lamp within thy hand
Ah, Psyche, from the regions which
Are Holy Land!

এই সঙ্গে কবিতাটির বিষ্ণু দে-র করা বাংলা ভাষান্তর পড়ে নিতে পারি। লেখা বাহুল্য, শিরোনাম 'হেলেনের প্রতি'।

'হেলেন, তোমার রূপ মোর মনে হয়
সেকালের ভিনিসীয় তরণীর মতো
সুগন্ধ সমুদ্র-বক্ষে শান্ত ধীরে বয়
ক্লান্ত প্রবাসীকে দীর্ঘপথশ্রমাহত
আপন স্বদেশে সমাগত।

কত না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক বয়ান
নেয়াড তোমার লাস্য মোরে আনে ঘরে
গ্রীসে, চিরগৌরবের আদি পীঠস্থান
আর রোমে আছিল যে বৈভবশিখরে।

ঐ! দেখি বাতায়ন বেদীতে উদ্ভাস
আভঙ্গে খোদাই স্তব্ধ স্থির মূর্তি তুমি
মর্মরের দীপ জ্বলে করপুট চুমি।
আহা সাইকি! যেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি!'

সংহত, সংক্ষিপ্ত কবিতার কথা বলেছিলেন অ্যাডগার অ্যালান পো। 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটি সেই brevity এবং Suggestive indefiniteness-এর উদাহরণ। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে 'বনলতা সেন' ততটা সংক্ষিপ্ত নয়—বরং কিছুটা ছড়ানোই বলা যায়। আর অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতের কবিতা কি 'বনলতা সেন'? দুটি কবিতার মধ্যে অবশ্য কোথাও কোথাও অন্তর্লীন অনুরূপতা রয়েছে। বিশেষত 'thy hyacinth hair, thy classic face' 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' বা 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' মনে করিয়ে দিতে পারে—যদিও বিষ্ণু দে'র অনুবাদ 'তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক বয়ান' পড়লে আমার তো মনে হয় 'বনলতা সেন' থেকে এই আনুবাদিক অনুষঙ্গ যেন অনেক দূরের। 'হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা'র সঙ্গে পো-র 'weary way-worn wanderer'-এর সত্যি কি খুব নিকট স্বারূপ্য রয়েছে! 'দারুচিনি দ্বীপ'-এর সঙ্গে কি 'Native Shore' খুব মিলে যায়! তবে দিশাহীন নাবিক স্বদেশ-তটভূমির স্বপ্ন দেখতেই পারে। মূলত দুটি কবিতার আবহ এবং প্রকরণ ভিন্ন। মেজাজ ও মনোভঙ্গির ফারাকও কম নয়। কবিতার উৎস ও প্রকাশপ্রবাহেও তফাৎ রয়েছে। ভাব, অনুষঙ্গ এবং উপকরণেও গুণগত অভিন্নতা নেই।

হেলেন সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের ধ্রুবসংস্কার ছাড়িয়ে যেতে পারেননি পো কিন্তু জীবনানন্দ ধ্রুপদী স্থাপত্যের কথা বললেও আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতার রূপচ্ছবি এঁকেছেন তাঁর আশ্চর্য কাব্যভাষায়। 'হেলেনের প্রতি' রচিত হয়েছিল সম্ভবত 'মাদার ফিক্সেসন' থেকে, আর 'বনলতা সেন' এক সাধারণীর জন্যে ইন্দ্রিয়ঘন প্রেমপ্রসূত।

'বনলতা সেন' নিশ্চিতভাবে আত্মজৈবনিক কবিতা। জীবনানন্দের উপন্যাস 'কারুবাসনা' থেকে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে ব্যাপারটি অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে যায় : 'কিশোরবেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল...সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে, কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে...বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা-পিসিমার সঙ্গে কথা বলল অনেকক্ষণ ধরে; তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে থেমে গেল, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনার দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তাকে আর আমি দেখি নি।' কবির উপন্যাস বনলতা সেনের নেপথ্য ইতিহাস ধারণ করে আছে। কিশোরকালের ছায়াঘন, অস্ফুট, অস্পষ্ট ভালোবাসার অন্যমনস্ক নায়িকা স্বপ্নকল্পনায় যেন ফিরে ফিরে আসে : 'অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা'—। 'কারুবাসনা'র রচনাকাল ১৯৩৩ আর 'বনলতা সেন' রচিত ১৯৩৪ সালে। আপন গদ্যের উৎস থেকে, কিশোরস্মৃতি থেকে মধ্যযৌবনে উৎসারিত এই অনন্য কবিতাটি কল্পনার লোকায়ন যেন। এবং অবশ্যই আধুনিক জীবনের স্পন্দন।

অ্যাডগার অ্যালান পো তাঁর কিশোরকালের বন্ধু রবার্ট স্ট্যানার্ড-এর মা জেন স্টিথকে নিয়ে লিখেছিলেন 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটি। এক বাস্তব নারী এখানেও কবির মানসসরোবর-উৎসে থেকে কবিতাপ্রবাহকে সচল করে দিয়েছিলেন। বিস্মিত বিমুগ্ধ কবি এক ঘনায়মান সন্ধ্যায় দূরের জানালায় দাঁড়ানো জেনকে দেখে হেলেনরূপে কল্পনা করে নিয়েছিলেন। দুটি নামের অন্ত্যমিলও লক্ষণীয়। তেমনি বনলতা সেন ও হেলেন। লাবণ্যময়ী অথচ ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস জেন বিগত হন ১৮২৪ সালে। তখন কবির বয়স পনের কিন্তু কবিতাটি রচিত হয় তারো সাত বছর পরে, যখন তিনি যুবক। তাহলে কবিতা সত্যি 'emotion recollected in tranquility'। রোমান্টিক সুদূরতা ও সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে এই স্মৃতিমথিত কবিতা মূলত এক মাতৃরূপিণীকে উৎসর্গীকৃত। 'বনলতা সেন' যেমন প্রেম ও প্রশান্তির অবিস্মরণীয় আশ্রয়প্রতিমা, তেমনি হেলেনও; তবে তা যেন মাতৃহৃদয়ের এক মায়াঘের নাকি স্বদেশ-ভূমির ভূগোলসীমানার জন্যে আকাঙ্ক্ষা অথবা মানুষের শেষ পরিত্রাতা মৃত্যুর বলয়। বলার কথা, এই দুটি কবিতায় একই মনোভাবের আত্মীয়তা থাকলেও সৃজন-বৈশিষ্ট্যের ফারাক যেমন উহ্য থাকেনি, তেমনি শেষ লক্ষ্যও তো এক নয়। দু-একটি রূপকল্পের সাধারণ সারূপ্য থেকে পরবর্তী কবি জীবনানন্দ যে প্রভাবিত বা প্রাণিত কবি এমন বলা যাবে না। পো থেকে গৃহীত উপকরণ জীবনানন্দের প্রতিভায় এক নবীনতর সৃষ্টির রূপময় অভিপ্রকাশ। তাঁর ভাষার চাল এতটাই অন্যরকম যে বনলতা সেনের শরীর জুড়ে হীরে আলোর মায়াবী বিচ্ছুরণ।

জীবনানন্দ একাকিত্বজর্জর, আত্মমগ্ন ও প্রায়-বিচ্ছিন্ন কবি। নিরাশ্রয় ব্যর্থতার বিষাদ ও অবসাদ তাঁকে ঘিরে রয়েছে, তবু কবিতাটিতে সব নদীর ঘরে ফেরার কথা শনাক্ত করে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তিলোভটুকুই প্রধানত বিবৃত। আগেই বলা হয়েছে কবি তাঁর স্বভাব-বিষণ্ণতা ছাড়িয়ে চরিতার্থতার পথে এগিয়েছেন এমন এক উপলব্ধি পাঠকমনে সঞ্চারিত। 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' আর তখন কথোপকথনহীন অন্ধকার যেন জীবন্ত হয়ে আলোর উৎসারে পর্যটনে ডাকছে কবিকে কিংবা পাঠককে। হাজার বছরের পথ হাঁটার প্রবল ক্লান্তির শেষে কোথাও 'পাখির নীড়ের মত চোখ' অপেক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে বসে আছে প্রেমিক কবির জন্যে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' জীবনানন্দ প্রেমের কবি এবং প্রেমিক কবিও নিঃসন্দেহে।

'পাখির নীড়ের মত চোখ'—এই অসামান্য বাকপ্রতিমা আপাত অসম্ভবের হাত ধরে নিয়ে যায় বাস্তব এক স্নিগ্ধ শুশ্রূষার আশ্রয়ঘরে। সবটাই বাস্তব কি! নাকি সাংকেতিক প্রার্থনা প্রতীকী পুতুলের জন্যে! কবি 'নীড় নয়—নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা' করেছিলেন। কবি এই সহায়ক সূত্রটি না দিলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেই চোখই সুন্দর, যা নিঃশব্দে ধারণ করে আছে 'নীড়ে'র নিমন্ত্রণ।

ক্লিন্টন বি সিলি এই রূপকল্পটির অন্যত্র ব্যবহার লক্ষ করেছেন এভাবে :

> Jibanananda employed the same image elsewhere...he did not much enjoy the time in 1929-30 when he taught at Delhi's Ramjas College. Sudhir Kumar Datta, fellow Brahmo from Barisal and a year or so his junior provided some companionship. They saw each other frequently. When Jibanananda first arrived in Delhi, Sudhir Kumar met him at the railway station. Of Sudhir Kumar on that occasion, Jibanananda wrote, more than five years later "...across his face, [that smile] of bird's nest-like assurance and shelter"... *(A poet apart, Page 122)*

সুধীর কুমার দত্ত প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৩৫ সালের জুন মাসে আর 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয়েছিল সে বছরই ডিসেম্বর মাসে। সুধীর কুমারকে প্রথম দেখেছিলেন কবি ১৯২৯ সালে—তখনই কি এই অসাধারণ শব্দপ্রতিমা তাঁর মনে এসেছিল! কে জানে! 'বনলতা সেন' কবিতাতেই কি তা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন! তাও জানা যায় নি। সংশয়ের মধ্যে থেকেছেন ক্লিন্টন বি সিলি কিন্তু প্রশ্নগুলি তাঁর ভাবনায় এসেছে। তবে এটুকু নিশ্চিত যে 'বনলতা সেন' সেই ক্লান্ত পথিকের কাছে নিরাপদ আশ্রয়, আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নপ্রতীক। 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'। এই গভীর হৃদয় 'পাখির নীড়ের মত চোখে' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপমাটি 'তুলনাগত নয়, মননগত' বলেছিলেন দীপ্তি ত্রিপাঠী। চোখের রূপের বর্ণনা কবি করেন নি, করেছেন মনোভাবের বর্ণনা। মনোভাবের মনোহারিত্ব বস্তুবিশ্বকে অতিক্রম করেই। কিন্তু মনোভাব প্রায়শই বস্তুবিশ্বকে আশ্রয়ও করে থাকে।

অ্যাডগার অ্যালান পো-র 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটি জীবনানন্দকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল 'বনলতা সেন' রচনায়—এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের আলোচনা। হয়তো পো-র এই কবিতাটির কিছু অনুষঙ্গ বীজ হয়ে পড়েছিল অনেক দিন জীবনানন্দের মনে কিন্তু যখন উদ্‌গত হল শব্দে তখন তা একেবারেই একটি ভিন্ন, নতুন এবং অবশ্যই জীবনানন্দীয় উজ্জ্বল উদ্ভাস। বদলের-এর La chevelure কিংবা কীটস্-এর On first looking into Chapman's Homar-এর অনুষঙ্গও তো মনে এসে যায় প্রসঙ্গত। তবু সেই ক্ষীণগ্রহণ কবিতাটিতে গ্রহণছায়া এনেছে এমন কখনোই মনে হয় না।

বদলের-এর জীবনে Jeanee Duval-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। Ernest Prarond-এর ভাষায় এই রমণী নিষ্ক্রিয়, সমতল বক্ষের, অসুন্দর ও অদ্ভুত বলে বর্ণিত। কিন্তু Nadar তাঁকে বর্ণনা করেছেন সমৃদ্ধ বক্ষসৌন্দর্যের অধিকারিণী হিশেবে। বদলের তাঁর কবিতায় কিংবা দুভালের যেসব স্কেচ এঁকেছেন তাতে Nadar-কেই সমর্থন করতে হয়। দুভাল-আশ্রিত কবিতাগুলি জীবনানন্দ পড়েছিলেন যেমন পড়েছিলেন ফ্যানি ব্রাউনের প্রেমিক কীটস্‌কে। কিন্তু সামান্য দু-একটি অনুষঙ্গ ছাড়া এঁদের কবিতা, এই দুই নারীকে নিয়ে লেখা কবিতা 'বনলতা সেন'-এর বীজভূমিতে সরষে দানার চেয়েও ছোট। বলতে চাইছি অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ রচিত আদ্যন্ত এক বাংলা মৌলিক কবিতা।

বদলের-এর La Chevelure (চুল) কবিতাটির কয়েকটি ইতস্তত পঙ্‌ক্তি ইংরেজি অনুবাদে উদ্ধার করি;

'Lives, aromatic forest, deep in you'
(সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ মনে আসছে কি!)
'Upon your downy twisted locks undone
I seek the sweet intoxication
of coconut oil, mingled mask and tar'.
('চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' আদৌ মনে আসে না।)

মূলত বদলের-এর কবিতাটি একেবারে অন্যমাত্রার। শুধু মনে হয় জীবনানন্দ দাশ বদলের-এর শব্দ, ধ্বনি, চিত্রকল্পের এবং ভাবনার হাওয়ামণ্ডলে কিছুক্ষণ শ্বাস নিয়েছিলেন। যেমন কীটসের Much have I travelled হাজার বছর ধরে পথপরিক্রমার প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরের জগতে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে একেকজন পূর্বজ কবির শব্দের ম্যাজিক পরবর্তীকালের কবিকে বিদ্যুচ্চমকে নিয়ে যায় নিজস্ব চিন্তার গ্রহকেন্দ্রে।

প্রতীকী কবিদের এইসব প্রত্যক্ষ উপকরণ জীবনানন্দের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু 'বনলতা সেন' রচনার পটভূমিতে অনেক বেশি কাজ করেছে আমাদের ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা, লোককথা, ভূগোল, দর্শন এবং সর্বোপরি আমাদের সাহিত্য। কালিদাসের যক্ষপ্রিয়া, ভারতচন্দ্রের কস্তুরী কিংবা রবীন্দ্রনাথের ['দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে/খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে/মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।'] রোমান্টিক নায়িকারা জীবনানন্দকে নিশ্চিত আলোড়িত করেছিল। সেই আলোড়নময় অন্তর্জগতের ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করতে পারি। আমরা খুঁজে নিতে পারি পূর্বজ দেশীয় কবিদের সমান অনুভবের অনেক পঙ্‌ক্তি কিংবা তাঁর সমকালের সতীর্থ কবিদের তুল্য পঙ্‌ক্তিমালা। আপাতত বলার কথা এই, লোকজ ও ঐতিহাসিক উপকরণে উপমার ঐশ্বর্যে ও সঙ্গীতধর্মিতায় 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা—মৌলিক তো বটেই।

শিলীন্ধ্র, শারদীয় ১৪০৫, বত্রিশ বছর পূর্তি জীবনানন্দ সংখ্যা, কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বনলতা সেন : আর এক দুখজাগানিয়া

জহর সেন মজুমদার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শেষ লেখা' নামক গল্পে পুরুষচোখের মধ্য দিয়ে নারীরূপ (নন্দর চোখ দিয়ে ভদ্রাদর্শন) দেখাতে গিয়ে লিখেছিলেন—'ওই একখানি রূপের মধ্যে সারা পৃথিবীর রূপের মঞ্জুষা।' 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতার নারী বনলতাকেও বলা যায় : সারা পৃথিবীর রূপের মঞ্জুষা। বিভূতিভূষণের গল্পে রাজকুমার নন্দ গার্হস্থ্যপ্রেমের সুষমা থেকে ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে চলে গিয়েছিল বুদ্ধের প্রেরণা ও প্ররোচনায়। প্রিয় নারী ভদ্রার কাছে ফেরার তীব্র ইচ্ছা ছিল তার; কিন্তু বাসনাদমনের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কারণে আর ফিরতে পারেনি। জীবনানন্দের কবিতাটিতে, আমরা পুরুষপ্রেমিককে ফিরে আসতে দেখি প্রেম-অন্বেষণের মধ্য দিয়ে, বনলতার কাছে। কিন্তু বনলতাকে কি সে পায়? বনলতা কি তার হয়? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মধ্যেই 'বনলতা সেন' কবিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। ভাতের খিদে অস্তিত্ব তৈরি করে। আর সেই অস্তিত্ব স্বপ্নের খিদে নিয়ে হাজার বছর ধরে পৃথিবীচেতনায় রয়ে যায়। ভাতের খিদে পুরুষপ্রেমিককে এই পৃথিবীতে জৈব-অংশগ্রহণে ধরে রাখে। কিন্তু স্বপ্নের খিদেই তাকে উদ্ভাসিত করে, আপন স্বরূপ চেনায় এবং যুগ-যুগ ধরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হাজার বছর ধরে ঘুরবার একাগ্রতায় প্রেমের আলোছায়াময় প্রাচীনতাকে এই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে টেনে নিয়ে আসে পুরুষপ্রেমিক, তারপর প্রবহমান জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র অনুভূতিমালার আলোড়নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একসময় তার নিবেশী অনুভবের নিঃসঙ্গ-নির্জনে প্রেমকেই চিরে-চিরে দেখতে চায়, যে প্রেম একই সঙ্গে প্রাচীন এবং বর্তমান, হাজার বছর আগেও ছিল আজও আছে। সেই প্রেমকে বুঝে নেবার তাগিদ যার আছে সে কোথাও বদ্ধ থাকতে পারে না। প্রেম-অন্বেষণের দহনে বিচলিত হয়। হাজার হাজার বছর ধরে যে মানব-মহাযাত্রা চলেছে, সেই সর্বজনীন মহাযাত্রার মধ্যে তার নবজন্ম হয়। তমসার পর তমসার পর্দা সরিয়ে এই পুরুষপ্রেমিক নিজ হৃদয়ের প্রেমকে সযত্ন আবেগে বাঁচিয়ে জীবন-অভিব্যক্তির কল্লোলে এসে বারবার দাঁড়ায়। স্বপ্নভঙ্গ থেকে স্বপ্নে ফিরে আসে। হাজার বছর ধরে প্রেমের সর্বস্বতাকে বহন করতে করতে চকিতে নিজের যন্ত্রণা-আহত চলমানতার দিকে তাকিয়ে পুরুষপ্রেমিক একসময় আর পারে না; তখনই মনের দুটো কথা জানাতে সে বাধ্য হয়। বলে :

১. 'অনেক ঘুরেছি আমি'... ২. 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'...

হাজার বছর আগের প্রেমের পটভূমি আবছা হয়ে গেছে। আবার নতুন এক নির্বাচিত প্রেম-পটভূমির সাম্প্রতে দীর্ঘকালের অন্বেষণের বিস্ময়ে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় বনলতা। এই পুরুষপ্রেমিকের চলমান ক্রিয়া থেকেই বোঝা যায় কতো কতো প্রাচীনতম কাল থেকে সে পৃথিবীতে বেঁচে আছে। কিন্তু সিংহল থেকে মালয়, কলিঙ্গ থেকে বিদর্ভ জুড়ে চক্কর মারতে মারতেও সে আটকে আছে চিরকালীন একই বয়সে, বলা যায় প্রাকৃতিক প্রেমের বয়সে বা প্রেমের মনীষায়। এই ভাবেই আত্ম-অতিক্রমের মধ্য দিয়ে প্রেমিকার কাছে যাবার যে সড়ক

সে নির্মাণ করেছে, সেই নেপথ্যের বিষাদগ্রস্ত সড়কের নাম : ইতিহাস। বিষাদগ্রস্ত কেন? সিংহল-মালয়-কলিঙ্গ-বিদর্ভ প্রভৃতি সভ্যতার অবলোকনক্রিয়া সফল হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্ফল নিরন্তর অন্বেষণই ধারণ ক'রে আছে পুরুষপ্রেমিকের সেই সব একান্ত ব্যক্তিগত সড়ক। তাই বিষাদগ্রস্ত। ভ্রাম্যমাণ পুরুষপ্রেমিক জেনে গেছে, বনলতাকে পেলে তবেই সে এই পৃথিবীকে ক্রমে মানুষের শ্রেষ্ঠ চেতনার যোগ্য করে নিতে পারবে। ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণতার কারণে পুরুষপ্রেমিকের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, ভৌগোলিক অবস্থান নেই, এমনকি নামও নেই, সে শুধু এক 'আমি', শাশ্বত প্রেমের 'আমি', প্রেমের উজ্জীবনের মধ্য দিয়েই সে সমগ্রের অর্থপ্রকাশক। এই প্রেমার্থী পুরুষ-হৃদয়ের কাছে বনলতা সেন হল নাটোরের বনলতা। কিন্তু নাটোরের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই যদি বনলতা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতো, তবে কি তার এমন চির-আকর্ষণের ক্ষমতা থাকে? আমরা স্পষ্ট বলতে পারি, থাকে না। মনে রাখা দরকার যে কবিতার পুরুষপ্রেমিক স্বয়ং আমাদের জানাচ্ছে :

...'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন...'

অর্থাৎ এ-সবই অতীতের কথা। অতীতে, যখন বনলতা ছিল নাটোর-বাসিনী, তখনই তার দু-দণ্ডের সান্নিধ্য পেয়েছিল পুরুষপ্রেমিক। তারপরই উভয়ের মাঝখানে নেমে এসেছে একটা অন্ধকারের পর্দা, সময়ের পর্দা। যে দু-দণ্ড শান্তি পুরুষপ্রেমিক একদা প্রেমের রক্তিম সঞ্চারে বনলতার কাছ থেকে লাভ করে ছিল, সেই দু-দণ্ডের কথা মনে রেখে বা অতীত সান্নিধ্যের ক্ষণিক মুহূর্তে বিশ্বাস রেখেই তার চলা শুরু হলো সময়-আস্তরণ সরাতে সরাতে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পুরুষপ্রেমিকের যাত্রা শুরু হয়েছে নাটোরের চেনা বনলতার ধারণা থেকে। একটা সন্দেহ দ্রুত ঘনিয়েও ওঠে, তা হলো আগেকার চেনা বনলতার রূপ ও স্বরূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়নি তো? একটা উৎকণ্ঠা; একটা সংশয়। পুরুষপ্রেমিক যে বনলতাকে চিনতো এবং পূর্বে শান্তি পেয়েছিল বলেই পুনরায় শান্তি পাবার দৃঢ় ধারণা নিয়ে অনেক যুগ না-দেখা বনলতার দিকে এগিয়ে আসছে—সেই ধারণা দুম ক'রে ভেঙে যাবে না তো? ফলে সমগ্র কবিতায় আমরা দুটি বনলতার আবির্ভাব-সম্ভাবনায় টান টান হয়ে উঠি। প্রথম বনলতা অবশ্যই চেনা এবং সে কেবলমাত্র নাটোরের-ই। কিন্তু দ্বিতীয় বনলতা? তার রূপ এবং স্বরূপ তো অচেনা। দীর্ঘ অদর্শনের কারণেই অচেনা। এই দ্বিতীয় বনলতাকে নিয়েই কিন্তু কবিতা। আমরা দেখলাম, জীবনানন্দ দেখিয়ে দিলেন তার দেহী রূপ; আমরা পুরুষপ্রেমিকের চোখের মধ্য দিয়ে যে বনলতাকে দেখলাম, তাঁর

চোখ	... পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
চুল	... চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ	... মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...
কণ্ঠ	... এতদিন কোথায় ছিলেন
সত্তা	... থাকে শুধু অন্ধকার

অন্ধকার দিয়ে তৈরি সত্তা, অন্ধকারেই তাকে দেখতে হয় এবং সেই অন্ধকারেই বোঝা যায় আবহমানকালের ইতিহাস তার শরীরের ভূষণ। ইতিহাসের অলঙ্কার দিয়ে সাজানো এই বনলতা সৌন্দর্য-রূপের চমৎকার উদ্ভাসে আর যে সেই নাটোরের বনলতা নেই, তা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়। দু-দণ্ডের শান্তি পুরুষপ্রেমিককে যে ইচ্ছাপূরণের গতিশীল যাত্রীতে পরিণত করেছে, সেই কামনাসৃষ্ট ইচ্ছাপূরণ আর কি সম্ভব? নাটোরের পার্থিব সময়-বৃত্ত ইতিহাসের পথ ধরে অপার্থিব সময়-বৃত্তে, রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রাবস্তীর কারুকার্য-ধন্য এই ক্ষয়হীন সৌন্দর্য—যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব এসে বনলতাকে মনোলতা'য় পরিণত করেছে। বাইরের বস্তুজগতের সব কামনা-বাসনা যেন এই সৌন্দর্যের

কাছে নগণ্য হয়ে যায়। বনলতা যতোক্ষণ নাটোরের ছিল, ততোক্ষণ সে বস্তুজগতেরই ছিল। কিন্তু বিদিশার নিশার মতো চুল এবং শ্রাবস্তীর সৌন্দর্য মাখানো মুখমণ্ডল ইতিহাসের প্রবাহ থেকে পেয়ে বনলতাকে চলে গেছে স্বপ্নজগতের গন্ধরঙের বিপুল আয়োজনে। যেখানে জীবনের লেনদেনের আর কোনো অর্থই নেই। বনলতাকে এবং চারপাশকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলে রহস্যময় এক অন্ধকার। পুরুষপ্রেমিকের হৃদয়ে তখনো একদা পাওয়া দু-দণ্ডের শান্তি জীবন্ত হয়ে আছে। সিংহল-মালয়-বিদর্ভ ঘুরে পুরুষপ্রেমিক এসে দাঁড়ায় এই আঁধার-প্রেক্ষাপটের পরিণামে। গতিশীল এই প্রেমিক মানবাত্মা তার স্বপ্ন, প্রেম, প্রচেষ্টা, উৎসাহ দিয়ে আঁধার চিরে বনলতাকে দেখতে চায় এবং বলে :

...'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে'...

নাটোরের যে-বনলতার জন্য এতো শ্রম, এতো দীর্ঘ হেঁটে এসে বনলতার সামনে দাঁড়ানো, তা কিন্তু অন্ধকারেই আবৃত হয়ে রইল। বনলতা আলোয় প্রতিফলিত হলো না। বরং অন্ধকারে শোনা গেল কণ্ঠস্বর :

...'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর, হঠাৎ দেখা হবার অপ্রত্যাশিত আনন্দের যোগস্থাপনে অনেক সময় মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। ভেবে পায় না তুমি বলবে না আপনি বলবে, একটা দ্বিধা একটা সঙ্কোচ একটা লজ্জা এসে ঘিরে ধরে।—বনলতার এই 'আপনি' সম্বোধন কি সেই সাময়িক আপনি-তুমির গণ্ডগোল বা দোলাচলতা? নাকি যাকে একদিন দু-দণ্ড শান্তি দিয়ে ছিল, সেই প্রেমিকপুরুষের তৃষ্ণার দরখাস্তের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির প্রবণতা? পাঠক হিসাবে আমরাও দ্বিধায় পড়ে যাই। এবং সেই দ্বিধা থেকে আমাদেরও মনে হয় যে এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মধ্যে থাকতে পারে ক্লান্তি (আমি তো অপেক্ষায়ই ছিলাম, অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে গেছি—এই জাতীয় স্বীকারোক্তি), থাকতে পারে রাগ (আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, এখন এতোদিন পরে এসবের আর কি দরকার—এই জাতীয় নির্লিপ্তি), থাকতে পারে হুল ফোটানো ব্যঙ্গ (এতোদিন পর মনে পড়লো, খোঁজ নেই খবর নেই, যখন তখন এলেই হলো নাকি—এই জাতীয় বিরক্তি)। কিন্তু কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি পাঠ করলেই টনক নড়ে যায় :

...'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন ...'

সব পাখি সব নদী যখন ঘরে ফিরে প্রসন্ন, তখন এইভাবে অন্ধকারে কেবল উভয়ের মুখোমুখি বসে থাকার একটাই অর্থ হয়। পুরুষপ্রেমিক তাঁর চলমানতা দিয়ে এই কবিতাটিকে প্রেম-অন্বেষণের কবিতা ক'রে তুলেছিল। আর বনলতা তার 'আপনি' সম্বোধনের দ্বারা কবিতাটিকে প্রেম-প্রত্যাখ্যানের কবিতায় পর্যবসিত করেছে। শিশিরের শব্দের মতোন সন্ধ্যা যখন জোনাকির রঙে ঝিলমিল করছে, তখন ক্রমজায়মান এক অন্ধকারে নাটোরের বনলতার সঙ্গে শ্রাবস্তীমণ্ডিত বনলতার নিঃশব্দ তফাৎ ঘটে যায় এবং এই দুই বনলতার মাঝখানের অন্ধকার ছুঁয়ে বসে থাকে প্রেমিকপুরুষ; দুই বনলতাকে পৃথক ক'রে দেয় ইতিহাস। কিন্তু মুখোমুখি বসে থাকার এই তামসতা, তাও তো কম পাওয়া নয়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে (১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটির অংশবিশেষ :

...'মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে,
... ...
আলাপ করলেম শুরু—
কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে

যেন কাছের দিনের-ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ ক'রে থাকা।'

(রচনাকাল ১০ই আষাঢ় : ১৩৪৩, শান্তিনিকেতন)

এই কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন বাদে পুরুষ ও নারীর হঠাৎ দেখা হবার ঘটনা প্রক্রিয়া। কালো রঙের শাড়ির মধ্য দিয়ে রচিত দূরত্ব রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে দিলেন। জীবনানন্দ শাড়ির কালো রঙ দিয়ে নয়, ঘনিয়ে আসা অন্ধকার দিয়েই প্রেক্ষাপট তৈরি ক'রে নিয়েছেন। দীর্ঘদিন বাদে দেখা হবার পরও রবীন্দ্রকবিতায় 'তুমি' সম্বোধন আপন হয়ে উঠবার প্রবণতাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু আপন কি আর হওয়া যায়? পুরুষ-আকৃতির ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনি এবং কোনোমতে দেওয়া দায়সারা উত্তর সবকিছুই নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেয়। প্রেম শেষ হয়নি; প্রেম ক্ষয় পায়নি। আছে, গভীরেই আছে। কিন্তু তাকে খুঁচিয়ে টেনে বার করা, রক্তাক্ত করা কাম্য নয়। সুতরাং

...'এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ ক'রে থাকা'...

চুপ ক'রে থাকার মধ্য দিয়েই হয়তো আবার সবকিছু নতুন করে শুরু হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই পুরুষ-নারীর প্রবাহিত ব্যবধান স্টেশন ও ট্রেনের প্রতীক-সাহায্যে প্রতিফলিত করেছিলেন। জীবনানন্দ সেখানে নাটোর ও শ্রাবস্তীর সীমা অ-সীমার ব্যঞ্জনায় ইতিহাসজাত অন্ধকার রহস্যময়তার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অনেক সমালোচকই এই কবিতাটির সঙ্গে এডগার অ্যালান পো রচিত 'To Helen' কবিতার ('Thy hyacinth hair, the clasic face...') সাদৃশ্য চিন্তা করেছেন; আমরা একটু অন্যভাবে কবিতাটিকে দেখবো এবং তা পাশ্চাত্য-চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নয়, দেখবো 'বনলতা সেন' কবিতাটি কি ভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যরসধারা থেকে নিজস্ব স্বতন্ত্র রস সংগ্রহে সফল স্পন্দন পেয়েছে। আমরা একটি নাটক এবং একটি উপন্যাসকে বেছে নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের (১৩৩৩) বিশুপাগল ও নন্দিনীর সম্পর্কসূত্রে 'বনলতা সেন' কবিতার অভ্যন্তরীণ থিমটিকে যাচাই করা যায়। বনলতা যেমন নাটোরের মেয়ে, নন্দিনী তেমনই ঈশানী-পাড়ার। নন্দিনীর প্রণয়-আকর্ষণ যে কম ছিল না এবং নন্দিনীকে পাওয়ার জন্য প্রেমিক ভক্তর সংখ্যাও যে একের অধিক, তা বোঝা যায় নন্দিনী-সংলাপে :

...'ও কী কঙ্কু যে...বড়ো লাজুক ছিল; যে ঘাটে জল আনতে যেতুম তারই কাছে ঢালু পাড়ির পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে।
দুষ্টুমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। —হায়রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না।'

(পৃ. ৭৪ মাঘ ১৩৮৮ সংস্করণ)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কঙ্কুদের প্রেমতৃষ্ণা নন্দিনীর দুষ্টুমিতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়েছে। প্রেম বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। একটা সময়পর্বে এসে থমকে গেছে দুঃখ পেয়ে। অথচ নন্দিনীর একটু ইশারায় কঙ্কুদের রক্তের জোয়ার উঠতো। কঙ্কুর মতোই নন্দিনীর ইশারায় বিশুপাগলেরও রক্ত নেচে উঠতো। নন্দিনীকে কাছে পেলে বিশুপাগলের মনে হতো

...পাখি এল নীড়ে / তরী এল তীরে

কিন্তু বিশুপাগল নন্দিনীকে পেলো না সম্পূর্ণ ক'রে। চিরবিরহের দুঃখ নিয়ে সে সরে গিয়েছিল দূরে, কিন্তু নন্দিনীকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রেমিক বিশুপাগল

জীবন-স্রোতের মধ্যে সময়-স্রোতের মধ্যে থেকে কেবল বুঝতে পারলো অন্তর্গত দুঃখ এবং প্রেমের পাওনা—এই দুইয়ের টানাপড়েন পাগলামি বা বৈরাগ্য দিয়ে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায় না। কারণ :

১. ...'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই'...

২. ...'দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের...'

দূরে গিয়েই নন্দিনী চলে এলো ভিতরের নির্জন-সত্তায়। বিশু পশ্চিমের জানলা দিয়ে মেঘের স্বর্ণপুরী দেখতে পেল। নন্দিনীর টানে টানে সে আবার যক্ষপুরীতে এসে পড়লো। নন্দিনীর অপ্রতিরোধ্য টান এড়াবে সে কেমন করে? তাই বহুদিন পর তাকে দেখে বা সামনে পেয়ে নন্দিনী যখন জানতে চাইলো 'কে তোমাকে আবার টেনে আনলে'—তখন বিশুপাগল উত্তর দিয়েছে :

....'একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।...তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' *(পৃ. ৪৯)*

এক মেয়ে-মরীচিকার প্ররোচনায় বিশুপাগল এই যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে এসে দীর্ঘদিন বাদে পুনরায় দেখতে পেল অপ্রাপণীয়া নন্দিনীকে, আশার অতীত নন্দিনীকে, দুখজাগানিয়া নন্দিনীকে—যে সব সময় রয়েছে তাঁর প্রাণের গভীরে। যাকে পায়নি বলেই বারবার বিশুপাগলের চোখের জলে লাগল জোয়ার। বিশুর গানের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে নন্দিনীর সঙ্গে তার দূরত্ব :

... 'আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভরে
তুমি যাও যে সরে
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো...'

ব্যথা দিয়ে সরে গেছে নন্দিনী। শুধু রয়ে গেছে সেই একদার স্পর্শ, মুহূর্তসুধা, যার দ্বারা আবিষ্ট বিশুর অনুভব কখনোই নন্দিনীর কাছ থেকে রেহাই পায় না। বহুদিন বাদে তাই প্রেমের পুনঃপ্রবাহে স্পন্দিত হবার জাগ্রত আকাঙ্ক্ষায় নন্দিনীর প্রেক্ষাপটে আবার এসে দাঁড়াতে হয়। নন্দিনী, কঙ্কুকে কষ্ট দেওয়া নন্দিনী, বিশুকে চিরদুঃখ উপহার দেবার নন্দিনী বিশুকে পুনরায় দেখে বলেছে :

...'দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে।...প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না—তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো!' *(পৃ. ৪৮, ৪৯)*

নন্দিনীকে পাবার জন্য রঞ্জনের সঙ্গে যে বাজি-খেলা, বিশুপাগল সে খেলা থেকেই বিদায় নিয়ে চ'লে গিয়েছিল। নন্দিনী হয়ে উঠলো তার কাছের পাওনা নয়, দূরের পাওনা। এইখানেই একটা গভীরের সূক্ষ্ম মিল অনুভূত হয় 'বনলতা সেন' কবিতাটির সঙ্গে। হাজার হাজার বছর ঘুরতে ঘুরতে পুরুষপ্রেমিক যেমন বনলতার কাছে আসে, বিশুপাগলও তেমনই করে এসেছে নন্দিনীর কাছে। বনলতা পুরুষপ্রেমিককে জিজ্ঞাসা করেছে : 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' অর্থাৎ এত দিন দেখা হয়নি কেন? বিশুপাগলকে নন্দিনী ঠিক সেই নারীমনের গভীর থেকে প্রশ্ন করেছে :

...'কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো'...

বনলতা এবং নন্দিনী, উভয়ের সংলাপের মধ্যেই রয়েছে সাদৃশ্য বা মিলের স্বাভাবিকতা। তফাৎ শুধু একটা জায়গায়। বনলতা আগত প্রেমিককে আপনি-সম্বোধন করেছে; সেক্ষেত্রে নন্দিনী তুমি-সম্ভাষণেই দ্বিধাবিসর্জন দিয়েছে। দুই নারীর কেউই অবশ্য প্রেমিককে চির-আশ্রয় দেয়নি, দিতে পারেনি। 'বনলতা সেন' কবিতায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবহমান অন্ধকার ও ইতিহাসসৃজিত সৌন্দর্য। 'রক্তকরবী' নাটকে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নন্দিনীর ভিতরে-বাহিরে রঞ্জনের নিবিড় সাহসী উপস্থিতি। পুরোপুরি জয় করবার দুঃখ বা পুরোপুরি গ্রহণের দ্বীপরচনার ব্যর্থতা উভয় প্রেমিকই টের পেয়েছে। বনলতার প্রেমিক পেয়েছিল দু-দণ্ডের শান্তি। নন্দিনীর প্রেমিক পেয়েছিল স্পর্শসুধা। বনলতার প্রেমিকের কাছে বনলতা হলো ক. পাখির নীড় এবং খ. অতিদূর সমুদ্রের দারুচিনি দ্বীপ। নন্দিনীর প্রেমিকের কাছে নন্দিনী হলো ক. আকাশ এবং খ. সমুদ্রের অগম পারের দূতী। বনলতার প্রেমিক পেলো অন্ধকারে মুখোমুখি নিঃশব্দে বসে থাকবার অধিকার। নন্দিনীর প্রেমিক হয়ে উঠলো 'অমাবস্যা', যা সে স্বীকার ক'রে নিয়ে বলেছে :

... 'আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।' *(পৃ. ৫৫)*

এই অন্তর্গূঢ় মিল চমকপ্রদ। দ্বিতীয় অভাবনীয় মিল লক্ষ্য করা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' (প্রকাশ ১৯৩৬) উপন্যাসের পরিবেশ-নির্মাণের সঙ্গে। কুবের চলে যাচ্ছে কেতুপুর ছেড়ে অজানা-অচেনা ময়নাদ্বীপে। দুপুর রাতে কুবের হেঁটে আসে কেতুপুর ঘাটে, যেখানে অন্ধকারে হোসেন মিয়ার নৌকা নোঙর করা; অন্ধকারে পদ্মার জলে ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে। নদীর কাছাকাছি জোর বাতাস। সেইখানে শাদা কাপড় পরিহিতা কপিলা। মানিক সেই অন্ধকার-বৃত্তান্তে দুটি নর-নারীর নৈকট্যলীলার কথা লিখলেন :

...'কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা। ছই-এর মধ্যে গিয়া সে বসিল।
কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?
...হ, কপিলা চলুক সঙ্গে।

(দ্রঃ মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড : পদ্মা নদীর মাঝি : পৃ. ১৫৭, গ্রন্থালয় : বৈশাখ ১৩৭৬ দ্বিঃ সংস্করণ)

'বনলতা সেন' কবিতাথিমের বিপরীতে অবস্থান করছে এই থিম। কবিতায় পুরুষপ্রেমিক এসেছে নারী বনলতার কাছে, নিবিড় হবার মনোবাসনায়। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, নারী এসেছে তার পুরুষপ্রেমিকের নিকট, অজানা রহস্যময় দূর দ্বীপের সঙ্গিনী হবার সাধে। মিলটা কোথায়? মিল গভীরের, ভিতরকথার। আসলে এইভাবেই প্রেমের পট তৈরি হয়। এবং তা অন্ধকারে। কপিলা উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব্যাকুল প্রণয়-পিপাসা নিয়ে এক আদিম প্রশ্ন করে :

...আমারে নিবা মাঝি লগে?

এইভাবেই প্রেমের জিজ্ঞাসা যুগে যুগে তীব্র। পুরুষ হাজার বছর ধরে হেঁটে আসে নারীর কাছে; নারীও অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে পুরুষে ধাবিত হয়। তারপর অন্ধকারে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন : 'আমারে নিবা?' পুরুষের প্রশ্ন নারীকে; নারীর প্রশ্ন পুরুষকে। কেবলমাত্র একটা 'হাঁ' শুনবার উৎকণ্ঠা, একটা দীর্ঘ অপেক্ষা ও ব্যাকুলতা। হাঁ অর্থাৎ গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রেম তার রক্তিম পাখা মেলে দিল। আর না? যতোক্ষণ পুরুষ থাকে হাঁ কিম্বা না-এর দ্বন্দ্বে কিম্বা যতোক্ষণ নারী থাকে হাঁ কিম্বা না-এর মাঝামাঝি অস্থিরতায়, ততোক্ষণ দমবন্ধ টানাপড়েন। কুবের অবশ্য 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে' বলেছে, আমাদের টেনশান-নিরোধ করেছে। কিন্তু বনলতা কিম্বা নন্দিনী? তাদের প্রেমিকরা টানে টানে এসেছে। এসে ধারাবাহিক সময়-স্রোতের অন্ধকারে বসে বনলতা-নন্দিনীদের 'দুখজাগানিয়া' রূপ ও স্বরূপই টের পেয়েছে।

বনলতা সেন ও জীবনানন্দের নায়িকারা

আহমদ রফিক

শ-পাঁচেক বছর আগে চিত্রশিল্পের অন্যতম 'গ্রেট মাস্টার' লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা আবক্ষ নারীপ্রতিকৃতি 'মোনালিজা'কে নিয়ে ইতালি-প্যারিস থেকে বিশ্বের সর্বত্র শিল্পরসিক, সংস্কৃতিমনস্ক মহলে কম আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি। এমনকি কয়েক শতক পর সে ঢেউ সুদূর বঙ্গদেশের সারস্বত সমাজকেও স্পর্শ করে। এর প্রধান কারণ মোনালিজার অস্ফুরিত অধরোষ্ঠ এবং চোখের গভীরতা ঘিরে রহস্যময় মায়াবী হাসি, যা দর্শকদের যেন জাদুস্পর্শে অভিভূত করেছিল, এখনো করে।

সে হাসিতে কটাক্ষ নেই, যৌথ-আবেদনের তির্যক ইঙ্গিত নেই; আছে নরম মাধুর্যময় সৌন্দর্যের প্রকাশ। ঐ সৌন্দর্যের কারুকাজ যদিও মোনালিজার আলতো হাসি ঘিরে, তবু তার কালো পোশাক ও চুলের অন্ধকার এবং পশ্চাৎপটে নিসর্গের কালো ও ফিকে ধোঁয়াটে উপস্থিতির আলো-আঁধারের মাঝে পূর্বোক্ত বিশ্বজয়ী হাসির রহস্যময়তা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। সৃষ্টি করেছে মুখাবয়ব ও বুকের ঊর্ধ্বাংশের আকর্ষণীয় রঙের সঙ্গে বৈপরীত্য।

মোনালিজা শিল্পী দ্য ভিঞ্চির ভাবনালোক বা স্বপ্নলোকের বাসিন্দা নন, বরং রক্তমাংসের মানবী লিজা (অর্থাৎ লিজা জ্যাকোন্দা) এক ইতালীয় অভিজাতের স্ত্রী। আর সে নারীর মুখচ্ছবিই যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের চোখে, শিল্পীসাহিত্যিকদের কাছে 'মাস্টারপিস' চিত্রশিল্পের মর্যাদা অর্জন করেছে। মোনালিজার হাসি রক্তমাংসের বাস্তবনারীর হলেও দর্শকের মুগ্ধচোখের আলোয় তা হয়ে ওঠে স্বপ্নলোকের মায়া, পার্থিব হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাসিতে আরোপিত হয়েছে অপার্থিব সৌন্দর্য। এক কথায় কালো পোশাক ও চুল এবং আলোছায়ার প্রাকৃত রূপময়তার পটভূমিতে এঁকে তোলা মোনালিজার মুখাবয়ব মর্যাদা পেয়েছে রহস্যময়ী মোহিনী নারীর। এসব দিক থেকে জাদুকরি রোমান্টিকতার আরেক নাম 'মোনালিজা'।

মোনালিজার মতো তেলরঙে আঁকা নারীপ্রতিকৃতি না হলেও রোমান্টিক স্বাপ্নিকতা ও প্রাকৃত রূপময়তার অসামান্য অনুষঙ্গে ভিন্ন স্থান কাল পরিবেশে বাঙালি কবির কলমে আঁকা শব্দচিত্রের নায়িকা-নারী বনলতা সেন। মোনালিজার মতো হাস্যমুখী এবং পুরোপুরি বাস্তবজগতের নারী হয়তো নয়, তবু রহস্যময়তায় রোমান্টিক, প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের নারী বনলতা সেন মোনালিজার চিত্রপটভূমি মনে করিয়ে দিতে পারে তার কলারসিক পাঠককে। বলা বাহুল্য, কবি জীবনানন্দ দাশের নায়িকাদের মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও পাঠকপ্রিয় বনলতা সেন। গভীর অন্বেষায় এ নায়িকার বাস্তবভিত্তিক পরিচয় হয়তো বা মিলতে পারে কবির অন্য কোনো কোনো নায়িকার পরোক্ষ প্রতিরূপে।

রহস্যময়তা, তা শব্দচিত্রে হোক বা তেলরঙে হোক, পাঠক-দর্শকচেতনায় অপরিসীম কৌতূহল সৃষ্টি করে। বোঝা-না-বোঝার, জানা-অজানার সীমারেখার আকর্ষণ বরাবরই বেশি। হয়তো তাই ন্যুড ছবির চেয়ে রসজ্ঞ দর্শকের চোখে অর্ধনগ্নিকার আবেদন অধিকতর। সেক্ষেত্রে গভীর হয়ে জেগে থাকে অজানাটুকুকে জানার আকর্ষণ। হয়তো তাই

চুল, চোখ ও অন্ধকারের প্রাকৃত প্রেক্ষাপট ও অনুষঙ্গ মিলে আঁকা শব্দচিত্রে নায়িকা বনলতা সেনের যে ভাবরূপ আর আলোছায়ার কারুকার্যে খচিত শৈল্পিক সৌন্দর্য তাই কবিতা পাঠকের চিত্তজয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর ইতিহাস-বিহারী চেতনার আলোয় 'বনলতা সেন' নাম্নী এমন এক নায়িকার রূপচিত্র এঁকে তুলেছেন, যা রমণীয়তা ও মাধুর্যে অসামান্য। আকর্ষণীয় এ নায়িকার বাস্তবভিত্তি হয়তো তাঁর আরেক নায়িকা 'শঙ্খমালা কিশোরী'র স্মৃতিচিত্রণে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নাটোরের ঠিকানা সেক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে যায়। পরে লেখা বনলতাবিষয়ক একাধিক এবং শঙ্খমালাবিষয়ক একাধিক রচনার সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ডায়েরির কিছু বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার তা স্পষ্ট করে তোলে।

ইতিহাস-চেতনা ও চিত্রসৃষ্টির প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণেই হয়তো জীবনানন্দ দাশ তাঁর নায়িকা-প্রধান কবিতার চরিত্র চিত্রণে চিত্রশিল্পীসুলভ প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন শব্দচিত্র এঁকে তুলে। 'বনলতা সেন'-এ এমন প্রকরণিক সৌকর্য সুস্পষ্ট। সেখানে ঠিকই মোনালিজার রহস্যময় হাসি নেই, কিন্তু আছে ইতিকথার প্রেক্ষাপটে বিদিশা নগরীর অন্ধকার রাত্রির নিবিড়রূপ নিয়ে আকর্ষণীয় কালো চুল, ইতিহাসখ্যাত শ্রাবস্তীর স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কারুকর্মে রমণীয় ও শ্রীময়ী মুখের রূপময়তা, আছে পাখির নীড়ের মতো প্রাকৃত রূপের চোখ, যা আয়ত বা দীঘল না হয়েও বুঝি সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে। এ সবই ঐতিহ্যনির্ভর সুষমায় আঁকা, ইতিহাসভিত্তিক বাস্তবতায় ঋদ্ধ।

বনলতা সেন এভাবে এমন এক শ্রীময়ী নায়িকা হয়ে ওঠে যার জন্য হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা যায়, বলা যায় 'যাত্রী আমি ওরে' 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' কিংবা 'আরো দূর বিদর্ভ নগরে'। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি, অন্বেষার মানসিক অবসাদভার সম্বল করে ইতিহাসনিষ্ঠ প্রেমিকের পক্ষেই 'জীবনের সফেন সমুদ্রের' পাশে দাঁড়িয়ে বলা চলে—'আমি ক্লান্তপ্রাণ এক' এবং প্রেমিকার স্বল্পকালীন সান্নিধ্য পরম পাওয়া রূপে বিবেচনা করে বলা চলে 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'। এরপর স্মৃতিচিত্র রচনাই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

'দুদণ্ড শান্তি' পাবার আনন্দিত উপলব্ধি নায়িকার অন্বেষায় 'ক্লান্তপ্রাণ' কবির কাছে মনে হয়েছে অচেনা সমুদ্রে দিকহারা নাবিকের হঠাৎ করে সুগন্ধি চারুচিনি-দ্বীপের মধ্যে সবুজ ঘাসের দেশ আবিষ্কারের অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির মতো। আর তা তাৎপর্যময় আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে প্রেমিকার উৎকণ্ঠ প্রশ্নে—'এতদিন কোথায় ছিলেন?'—এ প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই নয়, এতে মিলনের আয়োজন পরিপূর্ণ করে তুলতে যে-প্রাকৃত পরিবেশের উপস্থিতি, সেখানে দিনরাতের সন্ধিক্ষণ, এমনকি রাতের অন্ধকারে শঙ্খমালা নায়িকার প্রবেশ।

শঙ্খমালা কিশোরী কবির এক অকালপ্রয়াত নায়িকা, যে চেয়েছিল কবির সঙ্গে ঘর বাঁধতে (জীবনানন্দের ভাষায় 'আমার হৃদয়ে যে গো শঙ্খমালা কিশোরীটি বাঁধিতে আসিয়াছিল ঘর')। কিশোরী প্রেমিকার প্রসঙ্গ জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। এসেছে গ্রামীণ প্রকৃতির পরিবেশ রচনার মধ্য দিয়ে। সেখানে 'কান্তার' শব্দটি বহুব্যবহৃত। যে গ্রামীণ কান্তার ছেড়ে মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজধানী শহরে পাড়ি জমিয়েছেন কবি, নিতান্ত এক অসফল প্রেমহীন জীবনযাপনের বাধ্যবাধকতায়।

আর শহরে 'সারাদিন ট্রাম-বাস'-এর প্রতিকূল পরিবেশের ঘাতক চরিত্রে জীবনানন্দ মৃত্যুর গন্ধই পেতে থাকেন। বারবার হৃদয়ের গভীরে বেজে উঠতে থাকে কিশোরী নায়িকা শঙ্খমালার আহ্বান। অকালপ্রয়াত প্রেমিকার আহ্বানে একদিকে প্রাণ চায় 'অঘ্রাণের পাড়াগাঁর তেপান্তরে চলে যেতে, যেখানে রাঙা পশমের মতো বটফল ঝরে পড়তে থাকে.

যেখানে সন্ধ্যার বক কামরাঙা রক্তমেঘে শঙ্খের মতো শাদা পাখনা ভাসায়'। অন্যদিকে শঙ্খমালার প্রতি কবির আহ্বান এ পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর শঙ্খমালা যেন তাঁর জন্য আকাশে অপরিসীম নক্ষত্র বিছিয়ে রাখে, যে-নক্ষত্র জীবনানন্দের কবিতায় বরাবর আসা-যাওয়া করে বিশেষ উপাদান হয়ে।

'বনলতা সেন' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শঙ্খমালা' কবিতার নারীও নায়িকার ভঙ্গিতেই 'কান্তারের' পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে এসে ডেকে বলে—'তোমারে চাই'। কিন্তু এ কবিতা প্রয়াত প্রেমিকার উপাখ্যান রচনার নামে শোকগাথায় শেষ হয়। 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন' আর 'কড়ির মতো শাদামুখ' নিয়ে শঙ্খমালা চিতার আগুনে শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে স্মৃতিচিত্রে ধরে রাখা সম্ভব হয়। বলা চলে 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর'। এ পাওয়া না-পাওয়া নিয়েই জীবনানন্দের প্রেমের উপাখ্যান।

বনলতা সেন আর শঙ্খমালার পারস্পরিকতায় দুজনই যেন কবির প্রধান নায়িকা হিসাবে একই আসনে বসে থাকে। প্রয়াত প্রেমিকার জন্য মনস্তাপ 'বনলতা সেন' ও 'শঙ্খমালা' সিরিজের কবিতায় প্রায় একই সুরে ধ্বনিত হতে থাকে। দুই নায়িকার মধ্যে পার্থক্য ততটা বড় হয়ে দেখা দেয় না। গ্রামীণ কিশোরী প্রেমিকার জন্য রচিত শোকপঙ্‌ক্তিমালা পরবর্তীকালে লেখা বনলতা সেন বিষয়ক অগ্রন্থিত কবিতায় প্রায় একই চরিত্র নিয়ে ফুটে ওঠে—

শেষ হ'ল জীবনের সব লেনদেন,
বনলতা সেন।...
(কেন যে সবার আগে তুমি)
ছিঁড়ে গেলে কুহকের ঝিলমিল টানা ও পোড়েন
কবেকার বনলতা সেন।

ধরে নিতে হয় কবির প্রেমিকা বাস্তবিকই প্রয়াত—তার নাম শঙ্খমালা হোক বা বনলতা সেনই হোক। সে নায়িকা নাটোরের হোক বা বরিশালের গ্রামীণ প্রাকৃত পরিবেশে লালিত 'কান্তারের শঙ্খমালা'ই হোক। জীবনানন্দ দাশের ডায়েরিতে উল্লিখিত 'রুরাল গার্ল' তথা 'গ্রামীণ কিশোরীর প্রেম' কবির সৃষ্ট নায়িকা শঙ্খমালাতেই প্রতিফলিত বলে মনে হয়।

যেমন উপরে উদ্ধৃত কবিতায়, তেমনি 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রেমিকাকে প্রয়াত বলে ধরে নিতে হয়। সে জন্যই উক্ত কবিতার শেষ স্তবকে 'দুদণ্ড শান্তি'র স্মৃতি উদযাপনের জন্যই 'অন্ধকারে মুখোমুখি' বসার আয়োজন করা হয়। রক্তমাংসের সজীব নায়িকার বদলে প্রেমের পূর্বস্মৃতিই বাস্তবের রূপ নেয়। তাই 'দিন শেষে শিশিরের শব্দের মতন রোমান্টিক পরিবেশে সন্ধ্যা নামে, পৃথিবীর সব আলো নিভে যায়'। আসে রাত। রাতের অন্ধকারে বিদেহী নায়িকাকে নিয়ে প্রেমের নিঃশব্দ উদযাপন জমে ওঠে।

স্বভাবতই অন্ধকার এ মিলনের পটভূমি রচনা করে। একই কারণে এ মিলনের স্মৃতিচিত্র রোমান্টিক ও স্বাপ্নিক। একই সঙ্গে তা অপার্থিব হয়েও পার্থিব। বিচ্ছেদ-বেদনার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটাতেই বুঝি বনলতা সেনকে ঘিরে স্মৃতিচিত্র রচনা। প্রেমের দ্বিমাত্রিক চরিত্র প্রকাশ করার জন্যই সম্ভবত এ আলেখ্য রচনায় কিছু বিশিষ্ট শব্দ ও বাক্যবন্ধ সংকেত, শব্দের ব্যঞ্জনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট একাধিক কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। যেমন—'জীবনের লেনদেন ফুরিয়ে যাওয়া'র অনুষঙ্গে শিশির, শীত, সন্ধ্যা, অন্ধকার, হাজার বছরের প্রতীক, অন্ধকার ও জোনাকির আলো নিয়ে জীবন-মৃত্যুর বৈপরীত্য এবং সেই সঙ্গে বিশেষ গাছগাছালির ও পাখি-পাখালির প্রাকৃত পরিবেশ।

নানা দিক বিচারে রমণীয় রোমান্টিকতার সংহত কাব্যরূপ 'বনলতা সেন' (এমন কি 'শঙ্খমালা'ও) প্রেমের কাহিনী হয়েও রচনা-সৌকর্যের গুণে যেন এক একটি আলেখ্য,

কবিতা হয়েও চিত্রশিল্প (যদিও শব্দচিত্র)। এতে ঐতিহাসিক কাব্য-ঐতিহ্যের আরোপ, নায়িকার রূপ বর্ণনায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকর্মশৈলীর আরোপ, নায়িকার অন্বেষায় নায়কের অন্তহীন সময়-পরিক্রমায় শৈল্পিক ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে।

একই সঙ্গে নায়িকার রূপময়তা সৃষ্টিতে প্রাকৃত সৌন্দর্যের আরোপ বনলতা সেনকে একাধারে দেশজ রূপকথার ও লৌকিক বাস্তবতার নায়িকায় পরিণত করেছে। গভীর বিচারে শঙ্খমালাও সম্ভবত ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান ও অতীত, ইতিহাস ও পুরাণ মিলেমিশে নায়িকার রূপাশ্রয়ী সত্তা নিয়ে যে 'মিথ' তৈরি করেছে তা-ই সংশ্লিষ্ট প্রেমকথার প্রাণ। এ জন্যই বনলতা সেন তথা শঙ্খমালার প্রেম স্বপ্নলোকের হয়েও অতীত ও বর্তমানের, স্বপ্ন ও বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। কবির প্রেমও তাই স্বাপ্নিক হয়েও বাস্তব উপলব্ধির।

কথাটা কারোরই অজানা নয় যে, জাগতিক সত্যের অনিবার্য টানে জীবন, যৌবন, প্রেম কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না, অন্তত বাস্তব ভুবনে হয় না। প্রেম আসে, প্রেম ঝরে যায়। জীবনও একই ধারায় মৃত্যুর মধ্যে শেষ হয়। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির গুণে জীবনের লেনদেন ফুরিয়ে যাবার পরও প্রেম স্মৃতিচিত্রে স্থায়িত্ব অর্জন করে। তাই প্রেম বা প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু ঘটে না। কবির ভাষায়, 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

২.

'জীবন-মৃত্যুর পর তুহিন দৃষ্টি মেলে' কবি ইয়েটসের ঘোড়সওয়ার যেমন নির্বিকার চলে যায়, অনেকটা তেমনি জীবনানন্দ দাশের একদা প্রাণময়ী নায়িকা স্মৃতির সত্তা অর্জন করে জীবন ও মৃত্যুকে জয় করে। অবশ্য করে কবির শৈল্পিক হাত ধরে। তাই সময়ের খেলাঘরে বনলতা সেনের মুখোমুখি হওয়া যেন এক অনিবার্য ঘটনা। যেখানে নায়িকা প্রবল কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করে—'মনে আছে?' জবাবে কবির সোৎসাহ স্বীকৃতিবাচক বক্তব্য—'বনলতা সেন?' এখানে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই উপস্থিত। স্মৃতি এভাবেই জীবনানন্দ দাশের নায়িকাদের সজীব করে তোলে।

জীবনানন্দ দাশ দেহাতীত বা ঐশী প্রেমের কবি নন, প্রবক্তাও নন। বরাবরই প্রবলভাবে দেহজ প্রেমে বিশ্বাসী ও সে প্রেম নিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দই ছিল কবি জীবনানন্দ দাশের বরাবর আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু ব্যর্থ প্রেম তথা পেয়ে হারানোর ব্যর্থতাই সম্ভবত কবিকে প্ররোচিত করেছিল প্রেমের স্মৃতিচিত্র তথা শাশ্বত কাব্যভাষা রচনার জন্য। তাঁর বোধে মনে হয় এমন এক হিসাবই বড় হয়ে ওঠে যে—প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ (অর্থাৎ মানব-মানবী) নিয়েই মানব-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা।

পূর্বোক্ত ত্রিকোণরূপে প্রেমের স্মৃতিচিত্র রচনায় প্রবল ব্যাকুলতা নিয়ে পরবর্তী জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের প্রেমের ধারাবাহিকতা নিয়ে একের পর এক নায়িকাদের তাঁর কাব্যভুবনে হাজির করেছেন। এদের কেউ কেউ নায়িকা হিসাবে বনলতা সেনের 'প্রোটোটাইপ', কখনোবা শঙ্খমালার। এদেরকে কাছে পাওয়ার অনুষঙ্গও কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার অপরিহার্য প্রাকৃত উপকরণ—বিশেষ করে আকাশ, নক্ষত্র, নানা ঋতুর প্রাকৃত রূপ, পাখি-পাখালি, শিশির, সন্ধ্যা, শীত, ঘাস, বেতফল ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর নায়িকাদের অধিকাংশ একই স্মৃতিচিত্রের প্রতিরূপ মনে হয়। অর্থাৎ সে নায়িকা হারিয়ে গেছে বা দূরে চলে গেছে, কখনো সুস্পষ্টভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। যে জন্য একাধিক অগ্রন্থিত কবিতায় তাকে বা তাদের কাছে পাওয়ার জন্য জীবনানন্দ দাশের আর্তি—

তুমি আর আসবে না, জানি আমি, জীবনের প্রথম ফসল
এখন আসিছে সন্ধ্যা আর শীত আর তীব্র শিশিরের জল।

এখানেও শীত, সন্ধ্যা, শিশির যেমন নায়িকার প্রাকৃত অনুষঙ্গ, যা হারানো নায়িকার কথা তুলে ধরে; তেমনি 'জীবনের প্রথম ফসল' ঘুরেফিরে গ্রামীণ কিশোরী শঙ্খমালার প্রথম প্রেমের কথাই মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে ধানসিঁড়ি নদীর পাশে গ্রামীণ আকাশে চিলের কান্নায় বেতফলের মতো চোখ যে নারীর কথা মনে আসে সে তো শঙ্খমালাই হওয়ার কথা।

তবে এ কথাও ঠিক, হারিয়ে যাওয়ার পর সে আর পৃথক সত্তায় স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয় না। মৃত্যুর পর রূপকথার রাঙা রাজকন্যাদের দলে ভিড়ে ঐ প্রতীকেই তার আসা-যাওয়া। আসা-যাওয়া স্মৃতিচিত্রের নায়িকা হিসাবে। জীবনানন্দের অন্য নায়িকাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুদর্শনা, সুচেতনা, সবিতা, শ্যামলী বা সুরঞ্জনা। পূর্বসূত্র যদিও পূর্বোক্ত গ্রামীণ প্রেমিকার, তবু সময় ও স্থান ব্যবধানে এদের কারো কারো প্রতীকী চরিত্র ভিন্ন—হৃদয়ের রোমান্টিকতা থেকে ক্রমশ মননের দিকে, প্রকৃতি থেকে সমাজ-জটিলতার দিকে এদের যাত্রা।

এদের মধ্যে শঙ্খমালা-বনলতা সেনের ধারাবাহিকতা নিয়েও স্বপ্ন থেকে বাস্তবের দেহঘনিষ্ঠ পরিবেশে সবিশেষে হয়ে-ওঠা নায়িকার নাম সুদর্শনা। বনলতা সেনের বা শঙ্খমালার উল্লেখ যেমন একাধিক কবিতায়, তেমনি সুদর্শনার দেখা মেলে একাধিক কবিতায়। বনলতা সেন কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত 'সুদর্শনা' শিরোনামের কবিতা ছাড়াও 'অন্ধকারে'; 'পৃথিবী' 'জীবন' 'সময়' ইত্যাদি কবিতা বিশেষভাবে সুদর্শনাকে নিয়ে রচিত। প্রকৃতপক্ষে বনলতা-শঙ্খমালার পরবর্তী নায়িকাদের মধ্যে সুদর্শনা অগ্রগণ্য।

সুদর্শনার গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রাকৃত প্রেমের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও নাগরিক আধুনিকতার স্পর্শ নিয়ে সুদর্শনা যুগের আলোয় দীপ্ত, একাধারে রমণীর প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার প্রতীক। অন্যদিকে সুদর্শনার সঙ্গে কবির তথা নায়কের প্রেম যে দেহজ সম্পর্কের ও রক্তমাংস-নির্ভর আকর্ষণের, তা বুঝতেও কষ্ট হয় না। অন্তত সুদর্শনা-বিষয়ক একাধিক কবিতায় তা কবির জবানিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'পৃথিবী, জীবন, সময়' কবিতাটিকে 'সুদর্শনা' শিরোনামে চিহ্নিত করলেও ভুল হতো না। এ কবিতার পটভূমি ও গতিময়তা এবং প্রাকৃত রূপ অনেকটা 'বনলতা সেন' কবিতাটির মতোই। 'সাগর আলো পাখি আর বৃক্ষের নির্জনতার' পটভূমিতে প্রেমের অভিসার, প্রেমিকার সান্নিধ্যে যাওয়া—সেখানেও শিশির ঝরার শব্দে বিকেল আর আপাত-আলোর অন্ধকারে সুদর্শনাকে নিয়ে নায়কের স্বীকারোক্তি।—

> একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

কিন্তু এ নায়িকার ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত নায়িকাদের পরিণামই যেন সত্য হয়ে ওঠে অন্তত বিচ্ছেদের বিষয় বিবেচনায়। কবির বয়ানেই স্পষ্ট হয় তাদের ভালোবাসার পরিণামের কথা—'এসব অনেক আগের কথা...কোথায় এখন সে সব আকাশ নক্ষত্র রোদ সত্য উজ্জ্বলতা'—অর্থাৎ দু-দণ্ড শান্তির পর সবকিছু হারিয়ে গেছে। এর অর্থ সুদর্শনার কাছ থেকেও কিছু প্রেম, কিছু সময় উপহার পেয়েছিলেন কবি, এমন কি 'পেয়েছি অনাথ আমায় সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে' (অন্ধকারে)—এমন স্বচ্ছ উপলব্ধির পরও সময়ের অত্যাচারে ভিন্ন এক সত্যই নায়কের আত্মদর্শন হয়ে ওঠে।

সে আত্মদর্শন ও আত্মানুসন্ধানের টানে 'পরিচিত রোদের মতন উষ্ণ শরীর' সুদর্শনা আর রক্তমাংসের নরম সুদর্শনা থাকে না। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সে একাকার হয়ে যায় এবং তা প্রধানত সময়-জ্ঞানে আত্মস্থ কবির ভিন্নতর উপলব্ধির কারণে। 'সুদর্শনা' শিরোনামের অন্য একটি অপরিচিত কবিতার শুরুতেই কবির বয়ান, 'সুদর্শনা মিশে যায় অন্ধকার রাতে'। অবশ্য মূল 'সুদর্শনা'তে জীবনানন্দ দাশ দেহ ও দেহাতীত প্রেমের দ্বন্দ্বে নিরক্ষরেখায় অবস্থান নিয়েছেন। একদিকে দেহঘনিষ্ঠ উপলব্ধি, অন্যদিকে অন্ধকারে গতায়ুপ্রেমের অর্চনা, যা প্রেমিকাকে পরমার অবস্থানে ঠেলে দেয়।

সুদর্শনার এই যে অন্ধকারে প্রয়াণ এর মূলে কিন্তু সমকালীন সভ্যতার অবক্ষয়, দূষিতরূপ এবং অস্থির সময়ের সহায়তায় শুদ্ধচেতনার মৃত্যু, যা প্রেম ও প্রেমিকাকে সুস্থ মূল্যবোধে স্থির থাকতে দেয় না। বণিকসভ্যতা মূলত এ জন্য দায়ী। বিরূপ পরিবেশে প্রাকৃত চেতনার সজীবতাও তখন অন্তর্হিত। 'সুদর্শনা'র প্রেমিক কবি যেমন প্রেমের বাস্তবতা-অবাস্তবতার দ্বন্দ্বে অস্থির, তেমনি তিনি সুন্দরের দূরতম অন্বেষার যাত্রীও। সময়ের অস্থিরতার সঙ্গে যুদ্ধরত কবি কখনো সুরঞ্জনা, কখনোবা সুচেতনা, আবার কখনো সবিতাকে কেন্দ্র করে প্রেমের আচারে নিশ্চিত সূত্রে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

সুরঞ্জনাও তার প্রেম ও সৌন্দর্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার শিকার এবং ক্ষতচিহ্নভরা সভ্যতার কৃত্রিমতার কারণেই তার সাধ ও অর্জনের দ্বন্দ্ব ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। তবু প্রেমিক এমন সত্যেই স্থিত হতে চায় যে, আবহমান কাল থেকে মানব সভ্যতার স্থিতি ও শান্তির পূর্বাপর শর্ত একটাই, আর তা 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'-এর নিশ্চয়তা। প্রকৃত প্রেমই মানুষ-মানুষীর সুস্থ সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে। 'দেহ দিয়ে ভালোবেসে'ই সুরঞ্জনাদের পক্ষে সম্ভব সভ্যতার সুস্থ বিবর্তনের পথে মানবজীবনে কল্লোলিত ভোরের সন্ধান জানাতে পারা।

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রেমাভিসারের বাস্তবতা একই ধরনের সত্যের সন্ধান দেয় 'সুচেতনা' নাম্নী নায়িকাকে নিয়ে জীবনানন্দ দাশের কাব্যিক কথকতায়। এখানেও 'বিকেলের নক্ষত্রের পাশাপাশি পরিচিত দারুচিনি বনানীর নির্জনতার আশ্রয়ে সুচেতনা'র আবির্ভাব। এখানে ক্লান্ত নাবিকের নতুন সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য 'ক্লান্তিহীন' প্রত্যাশা 'পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ'-এর মধ্যেও 'শিশিরস্নাত সমুজ্জ্বল ভোরের' আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে।

অসুস্থ সমাজ, ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা কি সুস্থ প্রেমের পরিবেশ তৈরি করতে পারে কিংবা গড়ে তুলতে পারে মানব-মানবীর জন্য শুদ্ধ প্রেমের মেলবন্ধন? পারে না বলেই সংবেদনশীল চৈতন্যে যত সমস্যা, যত জটিলতার সৃষ্টি, পৃথিবীতে 'অপব্যয়ী আগুন আর অবাঞ্ছিত আলো জ্বলা'র ধুম। জীবনানন্দের আরেক নায়িকা সবিতার 'নিবিড় কালো' চুল থেকে প্রাচীন সমুদ্রের নুন ঝরতে থাকে ঐতিহ্যবাহী নারীসত্তার প্রতীক হিসাবে। তার মুখের রেখায় যুগযুগান্তর পেরিয়ে আসা নবসূর্যের আলো সত্ত্বেও সবিতা সত্যিকার অর্থে প্রেমিকের জন্য সবিতা হয়ে উঠতে পারে না। তাকে মনে হয় 'কত কাছে—তবু কত দূর'। পূর্বতন নায়িকাদের মতোই আকাঙ্ক্ষার পৃথিবী 'একবার পায় তারে', কিন্তু স্থায়ীভাবে পায় না।

৩.

প্রেমের অভিসার-যাত্রায় কবি জীবনানন্দ দাশ কাব্যপুরাণ বা গল্প-উপাখ্যানের ঐতিহাসিক যাত্রার অনুসারী, প্রেমিকার অন্বেষণ ঐতিহ্যাশ্রয়ী। কিন্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়েও আধুনিক চেতনার কবি জীবনানন্দ ছিলেন সমকালীন নষ্ট সময়-সমাজ-সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে আশ্চর্যরকম সচেতন। বাস্তব সত্য বা জীবন সত্যকে অবহেলা না করেই প্রকৃতির প্রতি গভীর আসক্তির পরিচয় রেখেছেন। এ আকর্ষণ ছিল তাঁর মানসপ্রকৃতির সহজাত। সম্ভবত সে জন্যই মন ও মনন, হৃদয় ও মেধা, বোধ ও বোধির এক অদ্ভুত সমন্বয়ে তাঁর চেতনা গড়ে ওঠে, যে চেতনার ছাপ তাঁর জীবনযাত্রার জন্য সুখ বা স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে নি।

এমনি এক মিশ্র বা দ্বিভাজিত চেতনার কবি সম্ভবত অতিমাত্রিক নিসর্গপ্রিয়তার কারণে গ্রামীণ কিশোরীর সরল, নিখাদ প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন। সাধারণ বিচারে সে প্রেম 'সামান্য' বিবেচিত হলেও তরুণ জীবনানন্দ দাশ সে প্রেমের প্রতি মুগ্ধতায় একে যেমন 'সামান্য' ভাবেন নি, তেমনি চিরন্তনীর দিকে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এদিক থেকে

কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার সঙ্গে জীবনানন্দের প্রেমাভিসারের মিল সামান্যই। জীবনানন্দের এ মানসিকতা এবং প্রেমের ট্রাজিক পরিণতির প্রতিক্রিয়া 'ঝরাপালক' থেকে একাধিক কাব্যগ্রন্থের কবিতায় ধরা পড়েছে এবং এতটা স্পষ্টভাবে তা দেখিয়ে দিতে হয় না।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, গ্রামীণ প্রাকৃত পরিবেশের ঐ কিশোরী-প্রেমিকার অকালমৃত্যু কবিকে কক্ষচ্যুত করে এবং ক্রমে কবি হয়ে ওঠেন দ্বিভাজিত চেতনার শিকার, যা গভীর প্রভাব ফেলে তাঁর কবিতায়। শঙ্খমালা কিশোরীর প্রেমস্মৃতি স্থায়ী করতে গিয়ে চিরন্তনীর (প্রেমিকার) রূপ-কল্পনা মন থেকে মননে ঠাঁই নেয়। সম্ভবত এভাবেই শঙ্খমালাকে অতিক্রম করে শাশ্বত প্রেমের পরমা রূপ নিয়ে বনলতা সেনের আবির্ভাব। রূপকথার রাজপুত্র বা মহাকাব্যের পরাক্রমী নায়কের মতো জলস্থল-পর্বত পরিক্রমার সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার দুর্জয় সাহস প্রকাশের মধ্য দিয়ে বন্দি রাজকন্যা বা নায়িকাকে উদ্ধার করা বইয়ের পাতায় চলতে পারে, একালের কবি-রাজপুত্রের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে আধুনিক চেতনার কবি জীবনানন্দ দাশকে প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়েছে, লৌকিককে লোকাতীতে স্থাপন করে নতুনভাবে নায়িকার স্মৃতিচিত্র তথা রূপচিত্রের ক্যানভাস আঁকতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'দুদণ্ড শান্তির' পূর্বঅভিজ্ঞতা (তা পরেরও হতে পারে) চিরন্তনীকে পার্থিব ভুবনে স্থাপন করে পার্থিব-অপার্থিবের মেলবন্ধন ঘটাতে সাহায্য করেছে। নায়িকা বনলতা সেন তাই একাধারে হৃদয় ও মননের বৈপরীত্যে রচিত।

'বনলতা সেন'-এর পূর্ববর্তী বহুসংখ্যক কবিতায় বা অপ্রকাশিত কবিতা-পঙ্‌ক্তিতে পূর্বোক্ত প্রেমের বিচ্ছেদ-বেদনার আর্তি এমনই এক স্পষ্টতা নিয়ে প্রতিফলিত যে, তা নিয়ে প্রশ্নের বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। উদাহরণ টানতে জীবনানন্দীয় কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যায়—

যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিমঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝরো ঝরো
কামিনীর ব্যথার শিয়রে...
শুধু মেরু-আকাশের নীহারিকা, তারা
দিয়ে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া। *(ঝরা পালক)*

প্রয়াত বা হারানো প্রেমিকার জন্য আর্তি ও অন্বেষা জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত অপ্রকাশিত অনেক কবিতায় ধরা পড়েছে। যেমন—

'জানি না কোথায় তুমি—শবের ভিতরে সন্ধ্যা যেই আসে
নদীটি যখন শান্ত হয়,...
তখন তোমার মুখ—তোমার মুখের রূপ, আমার হৃদয়ে এসে
ভিজে গন্ধে চাঁপার মতন
ফুটে থাকে' (জানি না কোথায় তুমি), কিংবা
'তুমি আর আসবে না, জানি আমি, জীবনের প্রথম ফসল।
এখন আসিছে সন্ধ্যা আর শীত আর তীব্র শিশিরের জল'।

শেষোক্ত উদ্ধৃতিতে এটা স্পষ্ট যে, জীবনের প্রথম প্রেম আর প্রেমিকা চলে গেছে দূরে, বহু দূরে। প্রেমিকার জন্য কবির এ আর্তি যেমন প্রথমার জন্য, তেমনি বনলতা সেন পর্বে কি ঐ আর্তি একই প্রেমিকার জন্য, না-কি দ্বিতীয়া কারো জন্য—কবিতায় যার নাম বনলতা সেন? কবিতার খসড়া খাতায় ১৯১৯ সালের পর থেকে প্রেম ও প্রেমিকাকে হারানোর যে আর্তি আঁকিবুঁকিতে স্পষ্ট, তা কি ঐ কিশোরী-প্রেমিকার জন্য, না পরিণত বয়সী কোনো প্রেমিকার জন্য, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কিন্তু বনলতা সেনকে ঘিরেও অনুরূপ পঙ্‌ক্তি লক্ষ করার মতো—

কোথায় গিয়েছ তুমি আজ এই বেলা...
উচ্ছ্বাসে নদীর ঢেউ হয়েছে সফেন,
তুমি নাই বনলতা সেন।...
তোমার মতন কেউ ছিল কি কোথাও?
কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও।
কেন যে সবের আগে তুমি
পৃথিবীকে করে গেলে শূন্য মরুভূমি।

এ কবিতায় বনলতা সেন-এর উল্লেখ যত রহস্য, যত সমস্যা, সর্বোপরি এক প্রশ্নের জন্ম দেয়—শঙ্খমালা ও বনলতা সেন কি তাহলে পরস্পর থেকে ভিন্ন, না একই ব্যক্তিকে দুই ভিন্ন নামে পরিচিত করে তোলা? 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে দেহজ প্রেমবাসনা নিয়ে, পেয়ে হারানোর বেদনা নিয়ে যে গভীর আর্তির প্রকাশ, তা পরিণত বয়সী প্রেমিকার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে '১৩৩৩' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার; তারপর, মানুষের ভিড়...
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন দিকে জানি নি তা,...
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া।

এ কবিতায় প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট যে, এখানে প্রেমিকা প্রয়াত গ্রামীণ কিশোরী নয়, পরিণত বয়সী এ নায়িকা ভিন্ন কেউ, যে হতে পারে দিনলিপিতে উল্লিখিত প্রেমিকা, যে পরবর্তী সময়ে নিজেকে কবির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এ প্রেমিকাকেই যদি বনলতা সেন হিসাবে এঁকে তোলা হবে তাহলে এমন পঙ্‌ক্তি কবি লিখবেন কেন—

শেষ হ'ল জীবনের সব লেনদেন,
বনলতা সেন।

সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, প্রয়াত কিশোরী-প্রেমিকাকেই জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় নানারূপে শঙ্খমালা থেকে বনলতা সেন-এ পরিণত করেছেন, অনেকটা কথিত 'মনের মাধুরী মিশিয়ে'। যেমন মানসিক আর্তির টানে, তেমনি শিল্পসৃষ্টির তাগিদে জীবনানন্দ দাশ ঐ করুণ ঘটনা তথা ট্রাজেডির কাব্যরূপ এঁকে তুলেছেন 'বনলতা সেন' কবিতায়। ব্যক্তিক প্রেমকে তাত্ত্বিক দিক থেকে সাধারণ্যে উপজীব্য স্তরে নিয়ে গেছেন, আর শৈল্পিক বিচারে ঐ সৃষ্টিকে নিয়ে গেছেন অসাধারণ উচ্চতায়। বনলতা সেন তাই জীবনানন্দের হয়েও সব পাঠকের কাঙ্ক্ষিত নায়িকায় পরিণত।

সত্যি বলতে কি, জীবনানন্দ দাশের নায়িকাদের নিয়ে রচিত কবিতার ভিন্ন পটভূমি, তাদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান সত্ত্বেও গভীর বিচারে বলা যেতে পারে—ওরা সবাই একই নায়িকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সময়, সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশগত ভিন্নতায় তাঁর নায়িকারা একাধিক পটভূমিতে আবির্ভূত একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য—যদিও মূল বিষয় সেখানে প্রেম ও প্রেমের ব্যক্তিক সামাজিক অবস্থান। প্রেমের ট্রাজি-কমেডির পটভূমিতে প্রেমের সুস্থ ভবিষ্যৎ পরিণাম কবির আকাঙ্ক্ষিত। এ সবই এসেছে তাঁর নায়িকাদের স্মৃতিচিত্র রচনার প্রেক্ষাপটে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

(২০০৩)

বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক কবিতা-আলোচনায় কবিতার পুরো টেক্সট্‌কেই একটি বাক্য হিসাবে দেখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বাক্যমালা বা পরম্পরা নয়, বরং সমগ্র কবিতাটিই যেন একটি বাক্য। কিছু বাক্য দিয়ে গঠিত কবিতাটি একটি বাক্যই যেন—ফলে বাক্যের বিশ্লেষণে যে গঠন-অন্বয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, কবিতাটিকেও একটি বাক্য, একটি স্টেটমেন্ট হিসাবে ধরে সেভাবেই বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করা হয়। বাক্যের গঠনে বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামের মতোই কবিতার টেক্সট্-এও বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামকে দেখতে হবে, নোঅম চোমস্কির বাক্যের গভীর ও উপরি-গঠনের মতো কবিতারও উপরি ও গভীর গঠনের বিশ্লেষণ করা কাম্য। অবশ্যই সব রকম কবিতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো কবিতার উদ্ঘাটনে-আবিষ্কারে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

বনলতা সেন কবিতাটির ছত্র সংখ্যা ১৮। তিনটি স্তবক—প্রতি স্তবকে শব্দ সংখ্যা প্রায় একই—৪৫, ৪৬, ৪৬। কমা-সেমিকোলন-এর বিরতিসহ বাক্য তিনটি। অর্থাৎ বাক্য-শেষের পূর্ণচ্ছেদ তিনটিই আছে। এই তিনটি বাক্য কবিতার টেক্সট-এর বৃহৎ বাক্যটিকে গঠন করেছে। প্রতিটি বাক্যে যেমন একটি 'ফর্ম' ও একটি 'কনটেন্ট' থাকে, কবিতার বাক্যতেও তাই থাকে। চোমস্কিয় 'সারফেস স্ট্রাক্চার' হচ্ছে লক্ষ্য-যোগ্য বা প্রকাশিত 'expressive' স্তর বাক্যের; আর স্পষ্ট করে বলা যায় ধ্বনি বা লিখিত প্রতীক—বিমূর্তভাবে বললে অন্বয়, শব্দ ও শব্দাংশের সাজানোটি। কবিতার একটি যুক্তি-শৃঙ্খলা গঠন-শৃঙ্খলা থাকে, উপরিতলের গঠনে সেটিই ধরা পড়ে—প্রথমে যেটা জানানো হল তার পটে বা প্রতি-তুলনায় নতুন 'সংবাদ' এই তলে আসে—জটিল গঠনের পার্থক্য 'differentials'-টি স্পষ্ট করে। বিশেষভাবে নির্বাচিত (সর্বদা যে সচেতনভাবে হয় তা নয়) প্রকাশ-পদ্ধতি পাঠকের অভিজ্ঞতার ওপর নানা প্রভাব ফেলে। এই প্রকাশের গঠন থেকেই সে অর্থ নিষ্কাশিত করে। বলা যায় এই 'Structure of the Syntatic Surface'-ই কবিতা-পাঠের কর্মটির ওপর সরাসরি অভিঘাত আনে : বাঁদিকে থেকে ডানদিকে পড়ায় ছত্রের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, এর পুনরাবৃত্তি এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশের পদ্ধতিতেই কবির সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করে—প্রচ্ছন্ন কবিকে আবিষ্কার করা যায়, সর্বনাম-বিশেষ্য হয়ে ওঠে বিশেষ্য-সর্বনাম।

বনলতা সেন কবিতাটিতে প্রথম ছত্রের সর্বনাম 'আমি' কবিতার বাক্যে কবি, পরিশেষে মানুষে রূপান্তরিত—অর্থাৎ বিশেষ্যে তার উত্তরণ ঘটে। "হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে"—একেবারে গদ্যের বাক্য-গঠন অনুযায়ী যাকে বলা যায় 'গ্রামাটিক্যাল'। 'হাজার বছর' অর্থাৎ হিসাব মতো চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, আবার 'হাজার' অর্থে দীর্ঘ সময়কেও দ্যোতনা করা হয়ে থাকতে পারে। 'পথ' শব্দটি দু'বার

ব্যবহৃত—'হাঁটিতেছি', এই সাধু-ক্রিয়ায় সময়ের দূরত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের জায়গায় যখনই 'স্পেস' বা দেশ-এর প্রসঙ্গ এনেছেন কবি, তখনই ক্রিয়ার রূপও পাল্টেছে,—'অনেক ঘুরেছি আমি'। সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে—এই পরিক্রমা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে বস্তুত কোনো ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তো হাজার বছরের উল্লেখ করেন কবি। এই চক্রমণ 'নিশীথের অন্ধকারে', এরও আগে তিনি ছিলেন, 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'—'ধূসর' বিশেষণটি লক্ষণীয়, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে। অন্ধকার ও ধূসর—এই দুটি রং এখানে আছে। সময়ের দীর্ঘ দীর্ঘ পথে এই একাকী পরিক্রমা, অন্ধকারে ও ধূসর জগতে। 'অন্ধকার' শব্দটি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহৃত—অন্ধকারের এই পুনরাবৃত্তি পাঠকের মনে একটি নির্জন ক্লান্তির চেতনা আনে। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'—কবি নিজের পরিচয় এভাবেই দেন। ইতিমধ্যে দীর্ঘ লাইনের ছন্দে ও আ-কারের ব্যবহারে এই ক্লান্তি ও সময়ের দূরত্ব দুই-ই ধরা পড়ে। আর এর মধ্যেই কবি জানিয়ে দেন, 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'—শেষ দুটি শব্দে 'স' পর-পর থাকায় জীবনের চঞ্চলতা আভাসিত হয়, কিন্তু ঐ ক্লান্তিকে না ভেঙেই।

এরপর, কবিতার বড় বাক্যের দ্বিতীয় অংশে, আর কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেন সম্পর্কে বলা হয়। প্রথম বাক্যাংশে বা স্তবকে 'আমি' বা কবি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টিতে বনলতা সেন। বনলতা নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ : ইতিহাস অতিক্রমকারী প্রকৃতিরই অনুষঙ্গ জড়িয়ে। বিদিশার নিশা ও শ্রাবস্তীর কারুকার্য—বনলতার চুল ও মুখের উপমা-চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই দুটি নগরীই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত। দুটিই বণিকদের কেন্দ্রস্থল, বৌদ্ধপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ বনলতা ইতিহাসের পর্যায়ে প্রসারিত—সময়ের উৎক্ষেপ তার চুলে ও মুখে। লক্ষণীয় হল—সিংহল, সমুদ্র, মালয় সাগর, বিদিশা, শ্রাবস্তীর উল্লেখে 'আমি' বা কবিকে শুধু ক্লান্ত পথিক মনে হয় না, মনে হয় সমুদ্র-যাত্রী বণিক। আর প্রচ্ছন্ন উপমাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই চিত্রকল্পে—

> অতিদূর সমুদ্রের পর
> হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
> তেমনি দেখেছি তারে, অন্ধকারে;

এখানে নাবিকের এই উপমাটি, দারুচিনি-দ্বীপের উল্লেখে সমুদ্র-অভিযানকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিপর্যস্ত এক বণিকের চিত্রকল্পই নিয়ে আসে। সার্বিক এক সর্বনাশের ইঙ্গিত : সর্বনাশের হতাশা ক্লান্তির, অন্তহীন ক্রুদ্ধ জলরাশির পর সবুজ ঘাসের মতো বনলতা সেনকে মনে হয়েছিল। প্রকৃতির উপমা আবার। আর চোখের উপমা তাই হয় 'পাখির নীড়'। বিপর্যস্ত অভিযানকারীর কাছে 'নীড়'—আশ্রয়, শান্তিও ইঙ্গিত। সেই নারী প্রশ্ন করে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' 'ছিলেন' শব্দটিতে এ সময়ের ধ্বনিই উচ্চারিত। সে অপেক্ষা করে আছে, আসতে এত দেরি কেন? 'এতদিন' শব্দবন্ধটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি 'কোথায়' প্রশ্নবোধক এই শব্দটি কবিতার বাক্যের প্রথমাংশে দেখেছি—কোথায়-এর উত্তর দুরূহ—কারণ পথিকের ঠিকানা পরিক্রমায় পাল্টায়।

কবিতাটির বড় বাক্যের তৃতীয়াংশে অর্থাৎ তৃতীয় স্তবকে কবি ও বনলতা সেনের পরিচয়ের পর নতুন একটি 'সংবাদ' আসে। জানা হয়ে গেছে বনলতা নাটোরের—একটি বিশেষ স্থানের। যদিও সময়ের উড়ালে সে কবেকার বিদিশার, শ্রাবস্তীর। দেশ-কালের এই 'টেনশন' কবিতাটির টেক্সট্-এর, বাক্যের তৃতীয় অংশ নিয়ে আসে। এই অংশে প্রকৃতি : শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। এই অংশে রৌদ্র

ও জোনাকির রঙে ঝিলমিলের মতো শব্দ-শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে ধূসর—অন্ধকারের প্রায় পতিপক্ষকেই। শুধু তা-ই নয়, চিত্রময়তা শ্রাব্য চিত্রকল্পে আশ্রয় নেয় 'শিশিরের শব্দের মতন'। কিন্তু 'রৌদ্রের গন্ধ'র মতো চিত্রকল্পে, যা চিত্রময় নয় প্রত্যক্ষত। এই অংশে, পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলেও ধূসর অন্ধকার থাকে না : বরং পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন। পাণ্ডুলিপি—যে লিপিতে কারুর হস্তক্ষেপ ঘটেনি, যে লিপি ব্যক্তির নিজ জগতের একটি অকুণ্ঠ প্রয়াস : গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল। এগারো লাইনের 'দেখেছি তারে অন্ধকারে' আর ষোলো লাইনের 'গল্পের তরে...ঝিলমিল' পৃথক, কবিতার গঠনের 'differential'-টি স্পষ্ট। ১৭ লাইনে আবার ব্যবসার উপমা ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন। সব পাখি, নদী ঘরে আসে। সময়-ইতিহাস যেন এক নটরাজ-মুহূর্তে স্থির—থাকে শুধু অন্ধকার, এ অন্ধকার প্রথম দুটি স্তবক বা অংশের ধূসর দূর অতীতের অন্ধকার নয়, এ অন্ধকার বর্ণময়, নিজেকে পাবার, মুখোমুখি বসিবার—বনলতা সেন, নিজ প্রেম-অভিজ্ঞানকে আবিষ্কারের।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কবিতার বাক্যটির প্রথম দুই অংশে, অর্থাৎ স্তবকের 'আমি' বা কবির ক্লান্ত প্রাণের স্বরূপ জানানো ও বনলতা সেনের পরিচয় এবং দেখা পাওয়া এক গভীর স্তরের অর্থের দিক থেকে আপাতভিন্ন হলেও, মূলত এক : দুটি স্তবকের শেষের ছত্র দুটি 'নাটোরের'—এই বিশেষ চিহ্নে একসূত্রে গাঁথা। তবে উপরি বা বহির্স্তরের পার্থক্য, দুটি ভিন্ন ছবি পাঠকের মনে আঁকে—প্রথম স্তবকের লয় দ্বিতীয় স্তবকে আরও ধীর ও বিলম্বিত।

১. হাজার বছর ধ'রে পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
২. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

এই দুটি লাইন যখন পড়া যায়, তখনই মূল ছন্দ প্যাটার্নের তারতম্য না থাকলেও, নিজের মতো এক সুরময় স্থিতিস্থাপক যে পয়ার জীবনানন্দ নির্মাণ করেছিলেন, তার চারিত্র একই হলেও, পড়ার সময় পর-পর আ-কার ধ্বনিতে দ্বিতীয়টিতে দূর বিলম্বিত ছন্দস্পন্দ আসে। অথচ শেষ লাইনে, এই দূরত্ব অদূর থাকে না, নাটোরের বনলতা সেনের। বিদিশা-বিদর্ভ-শ্রাবস্তীর বিপরীতে এই নাটোর, একেবারেই বর্তমান ও প্রাত্যহিক। কিন্তু বনলতা, প্রকৃতির মতোই অম্লান : ইতিহাসের ক্লান্ত প্রাণের নীড়ের আশ্রয়, দূরগামী নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত পাখির প্রত্যাবর্তনের, বাঁচবার স্থল। কবি বা 'আমি' এখানে প্রচ্ছন্নভাবে ঐ পাখিরই মতন।

আসলে কবিতাটির গঠনের গভীর স্তরে প্রথমাবধিই এমন ঘটনা বা চিন্তার কথা বলা আছে, যা ভাষার সীমার বাইরের। 'আমি' এই সর্বনামটি যখনই প্রথম লাইনে এল, তখনই সামান্য মানুষ বা কবি সম্পর্কে এক পূর্বধারণা এসে যায়, যা কবিতাটির মূল মাধ্যম শব্দ বা ভাষার আগেকার। একাধিক স্থান ও ব্যক্তির নাম কবিতাটিতে আছে, যা কবিতার ভাষা-নিরপেক্ষ। 'আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—'আমি' বা মানুষ এই ভাষাতিরিক্ত বিষয়, 'হাঁটা' এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই সম্পর্ক কবিতাটির প্রক্রিয়া ও অর্থের দিক থেকে খুবই জরুরি। উপস্থাপনার প্রণালী বা পদ্ধতিতেই কবির দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। পথ হাঁটার প্রতিপক্ষে ক্লান্ত প্রাণ আসে। 'হাঁটিতেছি'—এই ক্রিয়ার ঘটমান বর্তমান রূপে স্পষ্ট কবি এখনও গতিময়। কবিতার শেষ অংশের সব ফুরাবার ও অন্ধকারে মুখোমুখি বসিবার জন্য যে থামা বা স্থিরতা, তা স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বদ্ধ হয়ে যাওয়া নয়। বরঞ্চ আর এক যাত্রার, নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞানকে আবিষ্কার করার চূড়ান্ত মুহূর্ত : বনলতা সেন একই সঙ্গে তার ইপ্সিতা সেই নারী, আবার অভিজ্ঞান—নিজেকে আবিষ্কারও বটে। এই দ্বন্দ্বময় বিষয়-

বিষয়ীর মিলনের যাত্রাই 'পথ হাঁটিতেছি' এই ক্রিয়ায় ধ্বনিত—আমি ক্লান্ত প্রাণ, কিন্তু চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। এ জীবন কোন হালকা উচ্ছ্বাস বা অর্থহীন কলরোল নয় : জীবনের সমুদ্র, এই চিত্রকল্পে জীবনের বিরাট ব্যাপ্তিই ধরা দেয়। কবিতাটির উপরিস্তরের বিশেষণগুলির দিকে মনোযোগ দিলেই, এই আততি লক্ষ্য করা যায় : একদিকে ধূসর, দূর, ক্লান্ত, অন্যদিকে সফেন সবুজ। আরও দেখার, কবিতাটিতে ঠিক যথার্থ বিশেষণ যাকে বলে তা কম, বরঞ্চ ক্রিয়া, হাঁটা, ঘোরা, হারানো, বলা, আসা, মুছে যাওয়া, নেভা, ফুরানো, বসা—ঘুরে ফিরে এসেছে। বার বার হারানো-নেভা-ফুরানো-বসার পাশাপাশি হাঁটা-ঘোরা-বসা-আসা-যাওয়ার ক্রিয়া আমরা পাই। উভয়ের এই অবস্থিতিতে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। বনলতা সেনের সে অর্থে কোনো বিশেষণ নেই—নাটোরের একটি স্থানবাচক চিহ্ন আর 'মুখোমুখি বসিবার'—এই ক্রিয়া আবার ক্রিয়ার শেষের কথা।

'বনলতা সেন' কবিতাটির বাক্যের, টেক্সটের ক্রমপ্রসারণে আধুনিক কবিতারই এক যাত্রা দেখি। য়াকবসেন দেখিয়েছেন, শিল্পশৈলী রোমান্টিকতা থেকে বাস্তববাদের মধ্য দিয়ে প্রতীকীবাদের অভিমুখী হয়েছে। বলা যেতে পারে রূপক থেকে লক্ষণার, আবার রূপকে ফিরে আসার এক প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। আবার ডেভিড লজ মনে করেন, আধুনিকবাদ ও প্রতীকীবাদ মূলত রূপকালঙ্কারী, আর আধুনিক বিরোধীই বাস্তববাদী ও লক্ষণাত্মক। বনলতা সেন-এর রূপ-প্রতীকী উন্মোচনে এটাই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দুই স্তবকে অর্থাৎ টেক্সটের দুই অংশে বনলতা সেন রূপক, নাটোরের বনলতা। কিন্তু দুটি অংশে দু'ধরনের উপাদানের ক্রম : একটির প্রসঙ্গে আরেকটি এসেছে। এর থেকে আসে শেষ অংশের প্রতীকী রূপান্তর। আগের দুই অংশের বস্তুভিত্তিক বিষয় প্রতিষ্ঠা ডানার শব্দ, রৌদ্রের ঘ্রাণ-এর চিত্রকল্পকে সম্ভব করে। নাটোরের বিশেষ স্থানের হাত ছাড়িয়ে বনলতা সেন স্বাধীন প্রতীকের মর্যাদা পেয়ে যায়। প্রথম দুই স্তবকের বাস্তব, কবিতাতিরিক্ত স্থান-নামের ভিত্তির ওপরেই আসে এই নির্বিশেষ প্রতীক : বনলতা সেনের মরণজয়ী চিত্রকল্পতে। এখানেই জীবনানন্দ য়াকবসনীয় অর্থে আধুনিক।

॥ ২ ॥

বনলতা সেন কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪২-এর পৌষে। ১৩৪২-এর আশ্বিনে প্রকাশিত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় বনলতা সেন আবার ফিরে আসে। কবিতা দুটির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেন ৪২-এর বনলতা সেনের স্মৃতিই ধরা :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;

প্রথম বনলতা সেনে কবি হাজার বছর পথ হেঁটেছেন, এ কবিতায় হাজার বছর অন্ধকারে খেলা করে 'জোনাকির মতো'। ৪২-এর কবিতার জোনাকির রঙে ঝিলমিল, এখানে এভাবে এল। আবার—

বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার,—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

এখানে এক ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের ছবি : দ্বারকা এই স্থানের উল্লেখে আরও স্পষ্ট। এই ভগ্নস্তূপ, প্রথম বনলতা সেনে নেই। বরঞ্চ বিদিশা-শ্রাবস্তীর জায়গায় দ্বারকা লক্ষণীয়। 'মৃত' এ শব্দও নেই।

শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন,
'মনে আছে?' সুধাল সে—সুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন?'

লক্ষণীয়, 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে এই কবিতায়, বনলতা সেনে যা হয়েছে 'আমি'। কবিতাটির প্রথম অংশে আমি-আমার মিলে অন্তত পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—এই বহুবচন নেই। আরও লক্ষণীয়, বনলতা সেনের দ্বিতীয় স্তবকে বা অংশে সে-তার-তারে মিশিয়ে পাঁচ বার ব্যবহৃত। শেষ অংশে বা স্তবকে সর্বনাম নেই : আছে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। 'হাজার বছর...' কবি আমাদের এই সমূহের ব্যবহারের সঙ্গেই আছেন 'মনে আছে?' ইতিমধ্যেই বিস্মরণ? কবি চিনলেন, জিজ্ঞাসা করলেন 'বনলতা সেন?' যেন, চেনা-না-চেনার মাঝামাঝি। নিজের চেনাকে নিশ্চিত করতে এই প্রশ্ন। এখনও জীবনের লেন-দেন শেষ। তবে ক্রিয়ার ব্যবহারের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। বনলতা সেন-এ আছে, 'ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন', আর 'হাজার বছর...'-এ, 'ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন'। ফুরায় ও ঘুচে গেছে, এক হিসাবে অর্থ এক, কিন্তু ব্যঞ্জনায় পৃথক। ঘুচে গেছের মধ্যে একটা বিনষ্টি, ধ্বংসের ইঙ্গিত। 'বনলতা সেন' কবিতাটিই কি কয়েক মাসের মধ্যে এভাবে পুনর্লিখিত হল? এই দুটি কবিতা মিলিয়েই কি রচিত হল সম্পূর্ণ বাক্যটি, কবিতার টেক্সট্‌টি?

কবিতার টেক্সট্‌টির গঠন অবশ্য বৃহত্তর পট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। শুধু ব্যক্তিগত বৃত্তেই এর সীমা নির্ধারিত নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর বা অন্তর্গত অংশের 'trans-individual mental structure'-এর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকেই। পরিবর্তমান বাস্তবের একটি বীক্ষা আসঞ্জিত রূপ পায় বড় কবির কাজে। ভাষা সামাজিক ঘটনা। বাইরের সামাজিক শ্রেণীগত, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বড় কবিতায় 'multi-accentuality' নিয়ে আসে। অনেক সময় তার ব্যবহৃত ভাষা, ছন্দের মধ্যেই প্রচলিতের বিরোধিতা থাকে, কর্তৃত্বের প্রতিবাদ থাকে, বিকল্প স্বর থাকে। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে বনলতা সেন কবিতাটি লিখিত। এই কবিতায় সেই সময়টি বিশেষভাবে জড়িয়ে। ২৬.১২.৪৫-এ জীবনানন্দ লিখেছেন, 'আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে ব'লেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা হয়তো নয়।' ১৩৫৩-র আষাঢ়ে আবার বলছেন, 'আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয়—যেমন 'ইতিহাসক্ষণে' একটু-আধটু করেছি—সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবি-মানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপে যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা—আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা মনে রাখেন না।' দুটি উদ্ধৃতি মেলালে বোঝা যায় সময় প্রকৃতি ও কাললগ্ন মানুষই তাঁর কবিতার উৎস। ১৯৩০-এর দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা শক্তির, ইতিহাসের নানা স্রোতের টানাপোড়েনে অস্থির : এর মধ্যেই বড় কবিকে গড়তে হয় নিজ বীক্ষাটিকে। সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের বাইরে রাজনীতি-অর্থনীতির আশা-হতাশায় সময় বড় হয়ে ওঠে জীবনানন্দের কবিতায়। অথচ সময়কে তিনি স্থির দেখতে পান না, কবির সময়ের নানা বিচূর্ণ থামগুলি তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এই সময়ে আবার নানা সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে—আজ যে সম্ভাবনাকে হয়তো আমরা অপূর্ণ দেখি, ১৯৩৫-৩৬-এ কিন্তু তা মনে হয়নি। তখন এই সময়কেই ধারাবাহিকতায়, একসূত্রে দেখতে ইচ্ছা হয়। শ্রাবস্তী-বিদিশা-বিদর্ভের ধূসরতাকে পেরিয়ে, আবার তার চুলের নিশা ও কারুকার্যের স্মৃতিতেই, সময়ের সূত্রেই বাঁচতে হয়। এ বাঁচাই ইতিহাস—মানুষের অবিরাম পথ হাঁটা। ব্যক্তি-জীবনের সব লেনদেনের শেষেও তাই বনলতা সেন জেগে থাকে, ক্লান্ত প্রাণ ইতিহাসের অন্ধকারেই খুঁজে পায় অভিজ্ঞানের দীপ্তি।

আধুনিক সাহিত্য-ভাবনায় লেখককে 'স্রষ্টা' হিসাবে না দেখে প্রোডিউসার বা উৎপাদক হিসাবে দেখেন কেউ কেউ। Pierre Macherey লেখককে দেখেন। সেই উৎপাদক

হিসাবে যিনি কিছু নির্দিষ্ট উপাদানকে, নতুন 'প্রোডাক্ট'-এ পরিণত করেন। তিনি এই উপাদানের স্রষ্টা নন। রূপ, মূল্যবোধ, পুরাণ বা অতিকথা, প্রতীক, আইডিয়লজি তাঁর কাছে আসে উৎপাদনের ইতিমধ্যে-প্রাপ্ত উপাদান হিসাবে। এ-সবকেই তিনি রূপান্তরিত করেন তাঁর 'প্রাকটিসের' দ্বারা। ভাষা ও অভিজ্ঞতার উপাদান একটি 'diterminate product'-এ রূপান্তরিত হয়। আর এই রূপান্তরে লেখক বা কবি কি বললেন সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কি বললেন না, কোন বিষয়ে নীরব থাকলেন তাও—এর মধ্যেই তাঁর সময়, তাঁর উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। বনলতা সেন কবিতার ভাষা, ছন্দ, প্রতীক জীবনানন্দ পৃথকভাবে সৃষ্টি করেননি : তাদের তিনি রূপান্তরিত করেছেন। পয়ারের মতো পুরনো উপাদানকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন, ক্লান্ত প্রাণের চিত্র ও চিত্রকল্পকে এমনভাবে মিশিয়েছেন যাতে মনে হয় অভিনব। বিখ্যাত 'পাখির নীড়ে'র চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি'র কথা মনে পড়ে, কিন্তু কত ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে 'তোমার দ্বারে' এসেছিলেন—'মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে'। জীবনানন্দের 'আমি'ও ইতিহাসের কত পথ সময় পেরিয়ে বনলতা সেনের কাছে পৌছায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'আমি' দূর হতে নিভৃত প্রদীপ জ্বালা দেখেন, তাই তাঁর 'আঁখি উৎসুক পাখি', আর জীবনানন্দের 'আমি'র জন্য থাকে অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। ১৯৩০-এর দশকের দেশীয় ইতিহাসের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে, আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার গোধূলিতে, আন্তর্জাতিক ফ্যাসী-নাৎসীবাদ-এর ভয়াবহ বিকাশেই হালভাঙা নাবিকের উপমা আসে, তখনই ইতিহাসের পথিক বলে, 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক।' আর রবীন্দ্রনাথও যেমন সেই আদি প্রকৃতি, বৃক্ষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন, তেমনি জীবনানন্দও হালভাঙা নাবিক সবুজ ঘাসের দেশের মতো বনলতা সেনকে পান—সব কিছুর শেষে অন্ধকারে এই নারীই একমাত্র থাকে। জীবনের সমুদ্র সফেনকে তিনি আপাতত দূরে রাখেন, এ সম্পর্কে তাঁর আপেক্ষিক নীরবতা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, মন্বন্তরের, কালো মেঘের সামনে এই ক্লান্ত প্রাণ—জীবনের কলরোলের মধ্যে যায় না। অথচ এই কবিই কয়েক বছর পর আর এক নাবিকের কথা বলেন :

> প্রায় ততদূর ভালো মানব সমাজ
> আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
> গ'ড়ে দেবে, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

ঐতিহ্য ও 'বনলতা সেন'

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ও নিদারুণ সফল সৃষ্টি জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'। এই কবিতা একলাই এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, জীবনানন্দের কালে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে এই কবিতার প্রভাব বহু কবির মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ পাঠক জীবনানন্দকে মনে না করতে পারলেও, বনলতা সেনকে খুব সহজেই মনে রেখেছেন। এমন কি, কোন আধুনিক কাব্যপত্রিকার নাম 'বনলতা' হল না কেন এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করে থাকেন।

প্রথম পাঠে এই কবিতা সম্পর্কে নানারকম অনুভবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বলেছেন, 'কী অনুভবের যাতনায় এমন একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখা হল।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'জীবনানন্দ', জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা, ময়ূখ, শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৬১)। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কবিতার ইতিহাস-সচেতনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদি বাঙ্গালীর পটভূমিকা উপস্থাপন করে আর এক ঐতিহাসিক কবিতারই সৃষ্টি করেছেন ('কবি জীবনানন্দ', উত্তরসূরী, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১)। সেই বিখ্যাত রচনাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে পারি : 'বাঙ্গালীর বিদিশার রাত্রি থেকে একটু অন্ধকার তুলে এনে (বোদলেয়ার-ও তেমন ভঙ্গি দেখিয়েছেন) কোশলের শিল্পশালার নর্তকীর মুখাবয়ব বসিয়ে, মালয় সুমাত্রা যাত্রী বঙ্গ-নাবিকের বি-দিশা ও ভ্রান্তি কল্পনা করে মসলার দেশ থেকে একটু ঘাস কুড়িয়ে তার ভাঙা হাল-সমেত প্রোথিত করে যে দৃশ্য-পট তৈরী, তেমন একটি গৃহান্ধকারের সাংসারিক জ্রণে নাটোরের পক্ষীজাতীয় মেয়ে এক ক্লান্ত-প্রাণ নাবিককে কুশল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন। এই সেনীয়া রমণী নাবিককে চোখের আহ্বানে পাখীর নীড়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যেহেতু তাঁর জন্মগত সংস্কার তাই। কিন্তু পরভৃতিক কোকিল ত জানে এ-নীড় তার নয়—দুদণ্ডের খেলা শুধু। সন্তানের লালনের জন্যে এই ধাত্রী কাকিনী।' কিংবা, 'নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ—এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকাল-ব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারব।' (বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন', কালের পুতুল)। জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর 'বনলতা সেন' লেখা হওয়ার আগেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ পেয়েছিল—'এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিল না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত' (ঐ, ঐ)। আমার মনে হয় 'বনলতা সেন' তার ঐতিহ্যানুসরণ ও ঐতিহ্যোত্তীর্ণতায় মহৎ সৃষ্টির দিকনির্দেশ করছে। এই কবিতার মধ্যেই তিনি পৃথিবীর, বিশেষত রোমান্টিক যুগের কবিতার সঙ্গে যুক্ত এবং যুগোত্তরও বটে। বস্তুত তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে যদি নাটকীয় কোন পর্ববিভাগে ভাগ করা যায় তাহলে এই কবিতাটিকে ক্লাইম্যাক্সে রেখে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলিকে প্রারম্ভ ও ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলিকে শেষ পর্বের ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে।

বোদলেয়ার কিংবা পো-র নাতিদীর্ঘ কবিতার সংজ্ঞার আবেগমধুর স্ফটিক দার্ঢ্য ফুটে উঠেছে আঠোরো পঙ্‌ক্তির এই কবিতায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মুক্তকের সিঁড়িভাঙা দীর্ঘ সব কবিতায় এর আগেই জীবনানন্দ নিজের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন—কিন্তু 'বনলতা সেন'-এ তাঁর প্রযত্ন অনেক সংযত, মনে হয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সংশ্লেষ ঘটেছে এই কবিতায়। চিত্রকল্পগুলি অবশ্যই জীবনানন্দের নিজের ('পাখির নীড়ের মত চোখ', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' ইত্যাদি), কিন্তু কবিতাটির মূল পরিকল্পনায় এটি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, যে-রোমান্টিক ঐতিহ্য একশো বছরের মধ্যেই পো, কিংবা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি ডসনের মধ্যে দেখা যায়, সৌন্দর্যের প্রতি কবির সেই অনন্ত নিরাকরণীয় পিপাসা—যার প্রকাশ পূর্ববর্তী অনেকের কবিতাতেই দেখা গেছে।

এই সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ রোমান্টিক বিষণ্ণতার আরোপে শিল্পসমৃদ্ধ হয়। মারিও প্রাৎস এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতাও আমরা সেই ঐতিহ্যবিধৃত রোমান্টিক কবিতাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করে বিচার করতে পারি। সেই রোমান্টিক কবিতার চরিত্র একদিকে পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যদিকে সমসাময়িক জীবন থেকে, যেমন করেছেন জীবনানন্দ (বনলতা সেন) কিংবা ডসন (সাইনারা)। পো দীর্ঘ কবিতার দাবি অস্বীকার করেছিলেন—তাঁর কথামতই সে কারণে তাঁর 'হেলেনের প্রতি' ও জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটির কথা মনে পড়ে। আমরা বলি না জীবনানন্দ সচেতনভাবে সেই কবিতাটি থেকে কোন শব্দ বা ছবি গ্রহণ করেছেন—নারীসৌন্দর্য দেখবার জন্যে দুই কবিকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপনই আমাদের লক্ষ্য। একই রোমান্টিক পরিমণ্ডলে যে দুজনের এবং আরো অনেকজনের অধিষ্ঠান তাই আমাদের বিচার্য।

জীবনানন্দের নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণকে, পো-র নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণের পাশাপাশি রাখা যায়। যেমন রাখা যায় জীবনানন্দের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' এবং পো-র 'the weary, way-worn wanderer', কিংবা জীবনানন্দের 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' ও পো-র 'perfumed sea'। 'অনেক ঘুরেছি আমি'র পাশাপাশি 'on desperate seas long wont to roam' কথাটিকেও রাখা যায়। কিন্তু এই মিল দেখে একটা কথাই আমাদের মনে হয়, তা হল রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির কবিতার যে ঐতিহ্য তাতে প্রত্যেকেই নিজের অবদান রেখে গেছেন। জীবনানন্দ ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে এই ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে গেছেন নতুনতর আবেগে, চিত্রগ্রন্থনে, বাগভঙ্গিমায়। পো যেখানে সরাসরি পৌরাণিক চরিত্র বেছে নিয়েছেন, জীবনানন্দ সেখানে নতুন পুরাণ সৃষ্টি করেছেন। রোমান্টিক কবির ইতিহাসের সুদূরতার বোধ পো-তেও যেমন, জীবনানন্দেও তেমন। পো প্রথমত হেলেনকে বেছে নিয়েছেন, তা ছাড়া তিনি গ্রীস ও রোমের মহিমা স্মরণ করেছেন। জীবনানন্দ নাটোরের বনলতা সেনকে আমাদের জগৎ থেকে বেছে নিলেও 'বিদিশার নিশা' কিংবা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' অথবা 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের' ক্লাসিক সুদূরতায় সৌন্দর্যবৃত্ত লক্ষ ও জাগ্রত করেছেন। হেলেনের ক্লাসিক সুদূরতার বিষাদ বনলতা সেনের মধ্যেও আমরা দেখি—সেই রোমান্টিক বিষাদ :

> সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

এই সৌন্দর্যচেতনা যার মধ্যে বিষাদের সুর স্পষ্ট বোদলেয়ারের মধ্যে ছিল, যেমন ছিল রোমান্টিক সব কবিদের মধ্যেই। বোদলেয়ারের 'সৌন্দর্য-প্রশস্তি' কিংবা 'দুই সুন্দরী ভগিনী' কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেমন স্মরণীয় 'রোমান্টিক আর্ট' নামে তাঁর গদ্যরচনা। ইংরেজি ডেকাডেন্ট কবিদের রচনাতেও সেই বিষাদ, মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি